সেপ্টেম্বর ২০০২ দশ টাকা

কিশোর ভারতী

হাওয়াগাড়ির রূপকথা

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান : পার্থ ভট্টাচার্য

এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

একসঙ্গে এতসব ?

শা র দী য়া ১ ৪ ০ ৯

কিশোর ভারতী

~~অ~~সম্ভব !

১০ উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহ ইমদাদুল হক মিলন
অদ্রীশ বর্ধন শক্তিপদ রাজগুরু অনীশ দেব
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

৬ বড় গল্প

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় বাণীব্রত চক্রবর্তী
ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবতী নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সুকুমার ভট্টাচার্য

কমিক্স

বহুরঙা নন্টে ফন্টে ৮ পৃষ্ঠাসহ মোট ৮০ পৃষ্ঠা

গল্প

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশ্বেতা দেবী সমরেশ মজুমদার
প্রফুল্ল রায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তারাপদ রায় হিমানীশ গোস্বামী
আনন্দ বাগচী অজেয় রায় কিন্নর রায় তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ভগীরথ মিশ্র
নটরাজন জাহান আরা সিদ্দিকী প্রণব ভট্ট তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় ঘনশ্যাম চৌধুরী
কুমার মিত্র অশোককুমার সেনগুপ্ত কমল চৌধুরী নির্মলেন্দু গৌতম সঙ্কর্ষণ রায়
সঞ্জীব সিংহ প্রদীপ্ত সেন তপনকুমার দাস...এবং আরও অনেকে।

নিবন্ধ ও ভ্রমণ

ডাঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামল চক্রবর্তী বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
অমরনাথ রায় ডঃ জগদ্রীন্দ্র মণ্ডল শমীন্দ্র ভৌমিক
ড. নীলাঞ্জনা সান্যাল ড. নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য

ছড়া-কবিতা

অন্নদাশঙ্কর রায় শঙ্খ ঘোষ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
পবিত্র সরকার সরল দে ভবানীপ্রসাদ মজুমদার
প্রদীপচন্দ্র বসু অশোককুমার মিত্র কার্তিক ঘোষ... আরও অনেকে।

প্রচ্ছদ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

দাম একই টা. ৬৯.০০

কিশোর ভারতী ৩৪ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা □ ভাদ্র ১৪০৯ □ সেপ্টেম্বর ২০০২

জেম্‌স ওয়াটের ভাবনার স্টিম ইঞ্জিনের পথ বেয়ে এল স্বয়ংক্রিয় চাকা-গাড়ি। ১৭৬৯ সালে। তারপর দিনে-দিনে, বিজ্ঞান যত এগিয়েছে, চেহারা-চরিত্রে বদলেছে হাওয়াগাড়ি। আরও গতিময়, আরামদায়ক হয়েছে। এসেছে দৌড়ে জেতার রেসিং-কারও। হাওয়াগাড়িকে নিয়েই ছবিতে সাজানো এবারের সুস্বাদু গল্পময় প্রচ্ছদ কাহিনি

হাওয়াগাড়ির রূপকথা
গৌরিক গাঙ্গুলি ৭

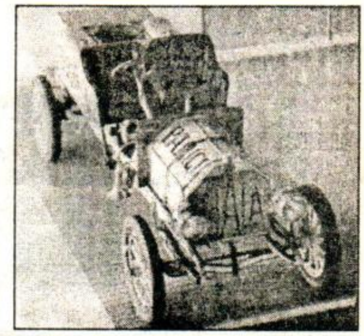

গল্প

ডারউইনের ডায়েরি থেকে
অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী ১৮

রুটিন
অবি সরকার ২৩

দড়ি বাঁধা ঘড়ি
জগত দেবনাথ ২৬

ঘাস
সঙ্কর্ষণ রায় ২৯

পটাই যখন পটকাল
সুকান্ত দাশ ৩৪

বৃষ্টি দিন
বিনোদ ঘোষাল ৩৭

গল্প লেখার গল্প
সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় ৩৯

বাংলা শিখতে হলে

বাংলা ভাষার পাঠশালা
প্রসন্ন গুরুমশাই ৪৯

যাঁদের ভুলতে চাই না

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
শ্যামল চক্রবর্তী ৫৩

* অনিবার্য কারণে 'রাতের পদ্মায়' এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়নি।

নিয়মিত আসর

আমাদের কথা ৩
তোমাদের কথা ৬
বিজ্ঞান দেশে দেশে ৪১
মনের কথা কই ৪৪
এবার তুমি করবে কী? ৪৬
তোমাদের দপ্তর ৪৮
হাসিঠাট্টা ৫২
বইয়ের দুনিয়া ৬৪

কমিক্স

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ ৪

আরব্য রজনীর গল্প
অমর মজুমদার ১৬

ছোটকু ও সুপার কম্পিউটার
সুদীপ্ত মণ্ডল ৪২

বগলা অ্যান্ড কোং
জুরান নাথ ৫০

ছড়া কবিতা

চৈতালী চট্টোপাধ্যায় ৩২
সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২
সমর পাল ৩২
অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় ৩২
শিবাশিস্ দণ্ড ৩৩
সুনির্মল চক্রবর্তী ৩৩
জ্যোতির্ময় মল্লিক ৩৩
অমিতাভ দাস ৩৩

খেলা

অর্থই অনর্থের মূল
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭

হরেক রকম

এটাই ঘটনা	ঠিক জবাবে ইনাম পাবে	ছড়াগড়া
দুল্লালাপ	গল্পাণু / সইসাবুদ	গালগপ্পো
বকবকানি	বন্ধু চাই	শব্দ হেঁয়ালি
ঠিকঠিকানা	কথার কচকচি	চাপান উতোর
হেঁয়ালি / মজারু	নিজে করো	বাতেলা ৬০

পরিচালক শুভাশিস ঘোষ ছবি জুরান নাথ

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক **দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**
সম্পাদক **ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়**
সহ-সম্পাদক **তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়**
উপদেষ্টা **অনীশ দেব** ॥ **তপনকুমার দাস** ॥ **শ্যামল চক্রবর্তী**
সম্পাদকীয় সচিব **মানস চক্রবর্তী** ॥ **নিরুপম ঘোষাল**
কার্যালয় সচিব **অনিমেষ পাল** ॥ **শুভাশিস লাহিড়ী** ॥ **শাশ্বত সেন**
কম্পিউটার গ্রাফিক্স **বরুণ রায়**
প্রচ্ছদশিল্পী **অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়**
কর্মাধ্যক্ষ **চুমকি চট্টোপাধ্যায়**
প্রধান কার্যালয় **১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯**
ফোন ৩৫০ ১৯৪৪
বিক্রয় ও যোগাযোগ **পত্র ভারতী**
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২৪১ ১১৭৫ ফ্যাক্স ৩৫৪ ০৪৬২
E-mail : patrabha@vsnl.net

পত্র ভারতীর পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন থেকে মুদ্রিত।

১০.০০

উপভোগ করুন

দুই জগতের সেরা

সুনিশ্চিত ফেরতলাভ

জীবনভর সুরক্ষা

এলআইসি-এর

জীবন রেখা

(তালিকা নং 152)

মানিব্যাক এবং হোল লাইফ পলিসির
একটি অনন্য সংমিশ্রণ

'জীবন রেখা' আপনাকে নির্দিষ্ট সময়ে সময়ে ফেরতলাভ সহ পরিবারের নিরাপত্তার আশ্বাস দেয় জীবনব্যাপী।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **সুবিধাসমূহ** : আরম্ভ হওয়া তারিখ থেকে প্রতি 5 বছর অন্তর জীবিতকালে মূল আশ্বাসিত অঙ্কের 10% প্রদান করা হবে
- **মৃত্যুতে** : মূল আশ্বাসিত অঙ্ক সহ কায়েমী বোনাস এবং চূড়ান্ত অতিরিক্ত বোনাস, যদি কিছু থাকে, তা প্রদান করা হবে
- **বোনাস** : সাধারণ প্রতিবর্তী বোনাস বিমাকারীর জীবিতকালে পুঞ্জিভূত হবে এবং তা মৃত্যুতে প্রদান করা হবে। চূড়ান্ত অতিরিক্ত বোনাস, যদি কিছু থাকে, তাও প্রদান করা হবে
- **দুর্ঘটনাজনীত সুবিধা** : এই প্রকল্পের আওতায় 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত (অন্যান্য সমস্ত পলিসি মিলে) দুর্ঘটনাজনিত লাভ

বিশদ খবরাখবর জানতে, আপনার কাছাকাছির এলআইসি শাখা অথবা এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

LIC No. 22/Ben/2002-03

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

জীবনের সঙ্গেও, জীবনের পরেও

Water is precious, conserve it.

Visit us at : www.licindia.com

Insurance is the subject matter of solicitation

ঠিক-বেঠিক

প্রিয় বন্ধু,

খরা কেটে বৃষ্টি নামতে-নামতেই বাতাসে উৎসবের গন্ধ।

পুজো মানেই কয়েকদিনের জন্য সবকিছু ভুলে থাকা।

কিন্তু সত্যিই কি ভুলে থাকা যায়?

পশ্চিমবঙ্গের দিকে-দিকে শুরু হয়েছে সন্ত্রাসের মিছিল। খুন-খুন-খুন! উগ্র রাজনীতির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

নাঃ—নাঃ, এসব আর বলা যাবে না। আমাদের এক প্রিয় বন্ধু তীব্র ভাষায় তার মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছে। তার বক্তব্য—সম্পাদকীয় কলামে আমি নাকি একপেশেভাবে এক বিশেষ দলের বক্তব্য প্রচার করছি।

বন্ধু, আমি সবাইকে জানাতে চাই, কিশোর ভারতী যখন ৩৪ বছর আগে প্রকাশিত হয়, তখন তোমাদের অনেকেরই জন্ম হয়নি। আমি নিজেও ছিলাম নিতান্ত কিশোর।

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই পত্রিকা শুরু করার আগেই ঠিক করে নিয়েছিলেন, কী হবে তাঁর মানসকন্যার চরিত্র।

সোজাসাপ্টা ভাষায়—কিশোর ভারতী চোখ বুঁজে থাকবে না। বা শুধু মনগড়া গল্প-ছড়া-উপন্যাসে ভুলিয়ে রাখবে না তার বন্ধুদের। সে যা সত্যি বলে মনে করবে, তাই বলবে। থাকবে সে সাধারণ মানুষের পাশে। তার লেখার মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েদের মনে যাতে সুস্থ জীবনবোধ গড়ে ওঠে, সহানুভূতি-সমবেদনা হয় দুঃখী মানুষের জন্যে, তার জন্য সে চেষ্টা করে যাবে।

অর্থাৎ কিশোর ভারতী শুধু ঝাঁ-চকচকে বসার ঘরে সোফার পাশে পড়ে থাকতে চায়নি, সে হয়ে উঠতে চেয়েছে কিশোর-কিশোরীর নিজস্ব কাগজ। তার পাতায়-পাতায় তোমরা হইচই করবে, সমালোচনা করবে, মনের কথা খুলে বলবে।

কৈশোর এমনই এক বয়েস, যখন শরীরের পাশাপাশি মনের মধ্যেও, চলে তুমুল উথালপাথাল। তোমরা তো কচি বাচ্চা নও, যে স্বপ্নের পৃথিবীতে বাস করবে। বলো?

কিশোর ভারতীর সম্পাদকের বক্তব্য তোমাদের পছন্দ নাও হতে পারে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে কিশোর ভারতী কখনই কোনও রাজনৈতিক দলের প্রচারমাধ্যম নয়।

বর্তমান শাসক বামফ্রন্ট ২৫ বছর আছেন পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতায়। তাঁরা কি সর্বক্ষেত্রে উন্নতি করতে পেরেছেন? পারা সম্ভব? গোটা দেশ যেখানে ক্রমেই ডুবে যাচ্ছে চোরাবালিতে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এরকম ভাবনা অলীক, অবাস্তব।

শিল্প-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সেচ অনেক ক্ষেত্রে এই সরকার দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন। রাজ্যের আদিবাসী-উপজাতি এলাকার অনেক জায়গাতেই উন্নয়ন হয়নি। তার ফলেই বিচ্ছিন্নতাবাদ দানা বাঁধছে, তরুণরা ভুল স্বপ্ন দেখছে। এত বছর পরে তাঁরা সেসব স্বীকারও করছেন। দেরিতে হলেও এখন ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। অন্তত আমরা কাগজ পড়ে যেটুকু জানছি, বুঝছি।

কিন্তু বলতে পার, এই সরকারের বিকল্প কী? এঁদের তো তবু ন্যূনতম একটা 'পলিসি' আছে, বিরোধী কোনও দলে তো সেটুকুও দেখতে পাচ্ছি না।

ফলে সাধারণ মানুষের দিকে তাকাতে হলে, তাদের কথা ভাবতে হলে এই সরকারের কথা চলেই আসে।

প্রিয় বন্ধুটিকে আবার বলি, ভাই! তুমি কিশোর ভারতীকে ভালবাস, আমরাও তোমাকে চাই! একটু চোখ-কান খোলা রাখো না! শুধু খবরের কাগজ বা টিভি নয়, পড়ার ফাঁকে দেশ ও সমাজ সম্পর্কে একটু পড়াশোনা করো। তাতে আর কিছু না হোক্, তোমার চোখ স্বচ্ছ হবে, দেখতে পাবে আসল ছ[illegible]

আজ আর বেশি কথা নয়।

শারদীয়া কিশোর ভারতী আর কদিন পরেই বেরুচ্ছে। সেজেগুজে। শুধু তোমাদেরই জন্য। এখানেই শেষ করি। ভালো থাকো সক্কলে। ইতি—

তোমাদের

[signature]

সম্পাদক-বন্ধু

কৈশোর এমনই এক বয়েস, যখন শরীরের পাশাপাশি মনের মধ্যেও, চলে তুমুল উথালপাথাল। তোমরা তো কচি বাচ্চা নও, যে স্বপ্নের পৃথিবীতে বাস করবে। বলো?

নন্টে আর ফন্টে
ইস্কুল-উদ্বোধন
বন্ধুর দেওয়া নলেনগুড়ের সন্দেশ দিয়ে ব্রেকফাস্ট।
আর কেল্টুদার নজর এড়িয়েই!
করাচ্ছি!
সবসময় মনে রাখবি, বোর্ডিঙয়ে বাইরের কোনো খাবার আমার নজর এড়িয়ে ঢুকতে পারে না।
খুব খারাপ হচ্ছে কেল্টুদা! দিয়ে দাও বলছি!
আজেবাজে খাবার খেয়ে শরীর খারাপ করতে দেব না! তাই আমি টেস্ট করে—
খবর্দার কেল্টুদা!
কী ব্যাপার, অত হইচই কিসের রে কেল্টু!
ইয়ে, আপনার জন্য নলেনগুড়ের সন্দেশ এনেছি স্যার!
বলিস কিরে! নলেনগুড়ের—, আহা!
দেখলি! আমাদের খাবার দিয়ে ব্যাটা তেল দিল।
এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।
শিগগিরই
এই যে কেল্টুদা, তোমাকেই খুঁজছি!
কী ব্যাপার! আজও নলেনগুড়ের সন্দেশ খাওয়াবি নাকি?
গ্রামে ইস্কুল উদ্বোধন করাবে? কিচ্ছু ভাবিস না। এব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে আমার!
গ্রামের নাম নীলপুর! আমরা ওখানেই থাকব!
ভুলো না কিন্তু!

স্যারকেও ভাবছি সঙ্গে নিয়ে যাব! এতে স্যারও খুশি হবেন।
আর কতদূর রে কেল্টু।
ওই যে জটলা, মনে হচ্ছে ওখানেই হবে!
আচ্ছা, নীলপুর স্কুল কোথায় বলতে পারেন?
আমি হলাম কেল্টুকুমার, ইস্কুল উ—
আর বইলতে হবে না! বুইতে পেরেছি, সঙ্গে ইনি কে?
ইনি হলেন আমার স্যার! এর আদেশ ছাড়া কোনো কাজ আমি করি না। হেঃ হেঃ!
ওটাই তাইলে নাটের গুরু!
হেই! কে কুথায় আছিস বেইরে আয়! ইস্কুল উচ্ছেদ করার মজা টের পাইয়ে দিচ্চি।
একিরে কেল্টু। তুই যে বললি ইস্কুল উদ্বোধন। তা না হয়ে জনতা এমন ক্ষিপ্ত হল কেন রে!
ক-ক-অ-আ আমি তো কিছুই—
এ নিশ্চয়ই ওদের কারসাজি স্যার!
ইস্কুল উদ্বোধনের নাম করে নিয়ে এসে, গ্রামের লোক দিয়ে প্যাঁদানির প্ল্যান! দেখাচ্ছি।
কেল্টুদা এখন বিশ্বের সেরা দৌড়বাজ। হাঃ হাঃ হাঃ
পোস্টার টাঙাবার প্ল্যানটা তোর দারুন ছিল, হিঃহিঃ!
গ্রামের ইস্কুল ভেঙে, স্যুইমিং পুল করছি, করব!
(কেল্টুকুমার)

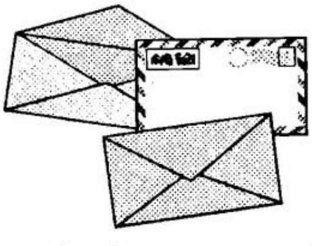

তোমাদের কথা

স্বরূপ কুণ্ডু
সত্যনারায়ণ ভবন
কাটোয়া, বর্ধমান

পত্রিকাটির নাম 'কিশোর ভারতী'। তবুও এটির মান এত উন্নত, এত উৎকৃষ্ট আর এত মনোগ্রাহী যে বড়রাও এটিকে হাতছাড়া করতে নারাজ। পত্রিকাটি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কর্তৃক সাদরে গৃহীত। আর 'হরে রুর কম' তো সর্বাধিক টিকে আরও বিস্তৃত করে তুললে ভালো হয়। আর সবথেকে আসল যে কথা তা হল, সাধারণ সংখ্যা, বিশেষ সংখ্যা এবং শারদীয় সংখ্যার দাম একেবারে বেঁধে দিন। যেমন, বিশেষ সংখ্যাগুলোর কোনওটি ১২ টাকা, কোনওটির দাম আবার ১৫ টাকা। এমনটি যত না-হয় ততই পাঠকের পক্ষে ভালো। আর একটা ছোট্ট অনুরোধ জানিয়ে চিঠি শেষ করব। প্রত্রিকাটি যাতে অজ-পাড়াগাঁয়ে-ও বহুল প্রচারিত হতে পারে, গ্রামের মানুযজনও যাতে এমন 'অমৃত ভাণ্ডার' হতে 'অমৃত' আহরণে সমর্থ হয়, সেদিকে একটু নজর রাখবেন। মুদ্রণত্রুটি যেন না-হয় তা দেখবেন। সর্বোপরি, পত্রিকার Quality যাতে না-কমে, যেন সম্মানের এবং জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে খুব সহজেই— সেদিকে নজর দেবেন।

বিতর্ক!

চাই! চাই না!

বেশ কয়েকটা চিঠি পেয়েছি। তোমরা আরও চিঠি পাঠাও। পুজোর পরের সংখ্যা থেকে শুরু হবে।

তুহিন কুমার দে
প্রযত্নে ঃ মৃণালকান্তি দে
১৯৩, আন্দুল রোড,
ব্লক-ডি এ/১১, হাওড়া

পত্রের প্রথমেই আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। আমি কিশোর ভারতীর একজন নিয়মিত পাঠক। কিশোর ভারতীর বিশেষ ভয় স্পেশাল সংখ্যাটি পড়ে ভীষণ আনন্দের সাথে-সাথে ভয়ও পেয়েছি। সবকটি গল্পই ভীষণ ভালো।

এছাড়া সেরা চিঠি উপ-বিভাগটি শুরু করার জন্য আপনাকে অনেক-অনেক ধন্যবাদ জানাই। নতুনরূপে 'হরে কর কম' বিভাগ দারুণ জমে উঠেছে। আশা করি পুজোসংখ্যা খুবই ভালো হবে।

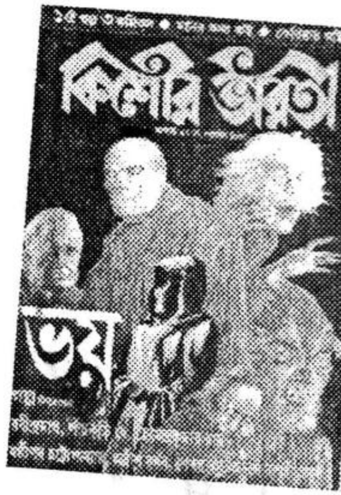

এবারের সেরা চিঠি

রাখী ধাড়া
প্রযত্নে ঃ শ্রী হরিচরণ ধাড়া
গ্রাম ঃ সাতাশী দক্ষিণ পাড়া, পো ঃ জি. আই. পি. কলোনী, জেলা ঃ হাওড়া

আগস্ট বিশেষ সংখ্যার সম্পাদকীয় ঃ সোজা, না উলটো? এর গোলকধাঁধায় উলটোভাবে তোমাদের কথাই বলতে চাই। যাদের ভুলতে চাই না-য় সুনীতিকুমারকে মনে থাকবেই। বিশেষ আলাপচারিতায় শতায়ু স্বাধীনতা সংগ্রামীর সাথে চিরকালই গালগপ্পো করতে চাই। বকবকানি আর হেঁয়ালি করে ঠিকঠিকানা না-হারিয়েও দূরালাপে তোমাদের কথা চলবে। টুকলু জগুমামার রহস্যজালে বন্দি হয়েও নন্টে ও ফন্টে-এর সাথে 'মনের কথা কই'-তে পেরে সমাধানের সূত্র মিলবে এটাই ঘটনা। মেলা তুমি শতাব্দী সেরা খেলোয়াড়কে এনে মহৎ কাজ করেছ। বিজ্ঞান দেশে দেশে আর প্রচ্ছদ কাহিনী ১৫টি ভূতের গল্প বলে 'ভয়' দেখিয়ে বলছ ঃ এবার তুমি করবে কী? অগত্যা তোমাদের কথা-য় ইতি টানলাম। তবে আরও যারা কিছুটা অচেনা রয়েছ, তোমরা রাগ না করে নব-সাজে পরে হাজির হবে। তোমাদের ছাড়া আমাদের কথা বলা যাবে না।

প্রবীর বিবাড়
বোকারো স্টিল সিটি, ঝাড়খণ্ড

আমার শ্রদ্ধা পূর্ণ নমস্কার নেবেন। আগস্ট মাসের কিশোর ভারতী পাওয়ার পর বুঝতে পারলাম জুলাই মাসের শব্দ হেঁয়ালি ভুলে ভরা। কাজের চাপে ঠিকমতো দেখতে পারিনি। যা হোক, ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য স্বরূপ কুণ্ডুকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

'শব্দ হেঁয়ালি'-তে ছাপার ভুলে উপর-নিচের সূত্রে, সূত্র সংখ্যা ৭, ১০, ১১ ছাপা হয়নি। আমার অনুরোধ, এই শব্দ হেঁয়ালির ছকটি আবার প্রকাশ করুন এবং স্বরূপবাবুর মতো অসংখ্য শব্দপ্রেমীকে সুযোগ দেওয়া হোক পুরস্কারটি নেওয়ার।

আমার দিক থেকে ভুল হলে অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন।

গৈরিক গাঙ্গুলি

হাওয়াগাড়ির রূপকথা

অনেকদিন ধরেই আকাশ বলে রেখেছিল তার বাবাকে যে, একদিন তাকে অনেক সময় নিয়ে গাড়ির গল্প শোনাতে হবে। আকাশের বাবা মাস্টারমশাই। ছাত্র পড়ান।

কিন্তু আকাশ জানে তার বাবা বইয়ের পড়াশুনার বাইরেও অনেক কিছুর খবর রাখেন। আরও জানে আকাশ যে তার বাবা পাখি, কুকুর, গাছপালা, সেতার, বাঁশি, বইপত্র ছাড়াও দারুণ ভালোবাসেন গাড়ি। তাই এই রবিবার বাবাকে আর রেহাই দিলনা আকাশ।

সকাল নটা হবে, বাবা তখন চা খেতে-খেতে চোখ বোলাচ্ছিলেন বাংলা, ইংরেজি মিলিয়ে গোটা পাঁচেক খবরের কাগজে। হাত ধরে টানতে-টানতে বাবাকে নিজের ঘরে নিয়ে যায় আকাশ। সেখানে তার পড়ার টেবিল, খাট আর একপাশে তার খেলনার তাক।

'হ্যাঁ এইবার বলো' আকাশ বলে, বাবা বলেন,—'তুমি ঠিক কী শুনতে চাও আকাশ? মোটরগাড়ির কথা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তাইতো শুনতে চাই' আকাশের জবাব। বাবা বলেন,—'দেখো মোটরগাড়ির কথা বলতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে মোটরগাড়ি এল কোথা থেকে—অর্থাৎ মোটরগাড়ির আগে কী গাড়ি ছিল, তার আগে কী ছিল ইত্যাদি।'

কেমন ভাবে গাড়ি এল

মানব সভ্যতার গতিই বদলে দিয়েছিল যে-দুটি আবিষ্কার, তার একটি হল আগুন এবং অন্যটি চাকা। আর এই চাকা আবিষ্কারের হাত ধরেই এল একচাকা, দুই চাকা এবং চার চাকা গাড়ি। একচাকার গাড়ি সাধারণত মাল বইবার কাজেই লাগত। আজও যেমন বড় বাগানের পাতা ফেলার জন্য, রাস্তা তৈরির সময় পিচ-পাথর ফেলার জন্য। দুচাকা গাড়ি অনেক রকম ছিল। ইতিহাস এবং পুরাণেও তাদের উল্লেখ আছে, যেমন রামায়ণের রথ বা গ্রিক পুরাণের চ্যারিয়ট। আরও আছে দুচাকা গাড়ি যেমন, ঠেলাগাড়ি, হাতে টানা রিকশা বা গরুর গাড়ি। এমনকি সাইকেলও তো দুচাকার।

এরপর এল চারচাকার গাড়ি। ইতিমধ্যেই নিজেরা না-টেনে গাড়ি টানার জন্য পশুদের ব্যবহার করতে শিখে গেছে মানুষ। তাই গরুতে টানা, ঘোড়াতে টানা, উটে টানা গাড়ি ততদিনে চালু হয়ে গেছে পৃথিবীজুড়ে।

'কিন্তু মোটরগাড়ির কী হল?' আকাশ জিগ্যেস করে। 'আরে সেই কথাই তো বলছি', বাবা বলেন।' ওইসব পশুতে টানা গাড়ি নিয়ে যেটা সমস্যা ছিল, তা হল যে, ওইসব গাড়ির গতি বা স্পিড বেশ কম ছিল। কিন্তু মানুষের দরকার ছিল গতি। আর তাই মানুষের মাথায় এল যন্ত্র দিয়ে গাড়ি চালাল কেমন হয়। যেই ভাবা সেই কাজ। বহু মানুষ শুরু করে দিলেন গবেষণা—কীভাবে যন্ত্রচালিত গাড়ি চালানো যায়। ততদিনে রেলগাড়ি, অর্থাৎ স্টিম-ইঞ্জিন আবিষ্কার হয়ে গেছে। আর তাই সেই পথ ধরেই এল পৃথিবীর প্রথম যন্ত্রচালিত পথে (রাস্তায়) চলার গাড়ি বা মোটরগাড়ি।

প্রথম গাড়ির কথা

কাগনট'স স্টিম ট্র্যাক্টর এল ১৭৬৯ সালে। স্টিম ইঞ্জিনে চালানো এই তিনচাকার স্বয়ংচালিত (ঘোড়াবিহীন) যানটির আবিষ্কর্তা ছিলেন নিকোলাস কাগনট নামের ফরাসি গোলন্দাজ বাহিনীর এক অফিসার। এই যানটি কামান বয়ে নিয়ে যাবার কাজে লাগত। সঙ্গে চড়ে যেতে পারত জনাচারেক সৈনিকও। গাড়ির টান যাতে ভালো থাকে তাই নিকোলাস ইঞ্জিন এবং বয়লার দুটিকেই বসিয়েছিলেন সামনের একটিমাত্র চাকার উপর। সেই কারণে এই গাড়ি সহজে ডানদিক, বাঁদিকে ঘুরতে পারত না। আর তাই প্যারিসের রাস্তায় অদ্ভুত যানটিকে চালাতে গিয়ে সামলাতে না-পেরে কাগনট একটি দেয়ালে ধাক্কা মারেন। ফলস্বরূপ পৃথিবীর প্রথম স্বয়ংচালিত পথ-যানের আবিষ্কর্তাই, বড় রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটানোর দায়ে অভিযুক্ত পৃথিবীর প্রথম ড্রাইভার হিসাবে জেলে যান।

এরপর ১৮০৫ সালে ফিলাডেলফিয়া শহরের মানুষকে অবাক করে দিয়ে রাস্তা দিয়ে এক অদ্ভুত-দর্শন গাড়িকে চালিয়ে নিয়ে গেলেন অলিভার ইভানস নামের এক স্টিম ইঞ্জিন প্রস্তুতকারক। যানটি আসলে একটি

ড্রেজার বা জলের নিচে পলি খুঁড়ে তোলার জন্য তৈরি নৌকো। কিন্তু অলিভারের কারখানা যেহেতু জলের থেকে বেশ দূরে শহরের মধ্যে ছিল, তাই ড্রেজারটিকে জল অবধি সহজে নিয়ে যেতে তিনি ওই ড্রেজারটির নিচে বিরাট চারটি চাকা লাগিয়ে রাস্তা দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই স্বয়ংচালিত ২০ টন ওজনের যানটি পথ দিয়ে ওই একবারই যাত্রা করেছিল— অলিভারের দোকান থেকে নদী পর্যন্ত। যানটির নাম হল ইভান'স অ্যাম্ফিবিয়াস ড্রেজ।

এরপর কার্ল বেঞ্জ নামে এক জার্মান আবিষ্কারক চারচাকার ঘোড়ায় টানা একটি গাড়িতে এক সিলিন্ডার একটি পেট্রোল ইঞ্জিন বসিয়ে চালান। কিন্তু গাড়িটিকে নিজের পছন্দ মতো চালাতে না-পারায় তিনি ওই ইঞ্জিনটিই একটি তিনচাকা গাড়িতে বসান। সেটা ১৮৮৫ সাল। ১৮৮৬ সালে তিনি ওই গাড়ির পেটেন্ট নেন। ১৮৯৭ সালের মধ্যে তাঁর কোম্পানি প্রতিদিন ৫০০ গাড়ি বানানো শুরু করে।

১৮৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস (স্প্রিং ফিল্ড)-এ চার্লস দুরিয়া নামে এক সাইকেল-ব্যবসায়ী পেট্রোলচালিত একটি মোটরগাড়ি তৈরিতে হাত দেন। এই কাজে সাহায্য করার জন্য তিনি তাঁর ভাই ফ্রাঙ্ক দুরিয়াকে ডেকে পাঠান। ফ্রাঙ্ক যন্ত্রপাতি তৈরি করতেন। দুজনে মিলে কাজ করা সত্ত্বেও কাজ খুব তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে না-দেখে চার্লস তাঁর সাইকেলের ব্যবসায়ে ফিরে যান। ফ্রাঙ্ক কিন্তু গাড়ি তৈরির কাজ চালিয়ে যান। ১৮৯২ সালের নভেম্বরের এক রাতে ফ্রাঙ্ক তাঁর মেশিনশপের পাশে নিজের তৈরি গাড়ি চালিয়ে পরীক্ষা করেন। সে-গাড়ি কোনওরকমে একটুখানি গড়ায় কেবল। কিন্তু সেই ছোট্ট গাড়িটাই কিছু পরিবর্তনের পর ১৮৯৩-এর সেপ্টেম্বরেই ছুটতে শুরু করে। ফ্রাঙ্ক তাঁর দ্বিতীয় গাড়িতে একটি চার সিলিন্ডার ইঞ্জিন বসান। সেই গাড়ি ১৮৯৫ সালের 'চিকাগো টাইমস হেরাল্ড' রেস জিতে নেয়। কিন্তু চার্লস ও ফ্রাঙ্ক দুই ভাইয়ের ঝগড়ার ফলে তাঁদের মোটর কোম্পানি উঠে যায়।

এইসবের কিছুদিন আগেই মিচিগানের এক মেশিনশপের মালিক র‍্যানসম ই. ওল্ডস তিনচাকার বাষ্পচালিত একটি গাড়ি বানিয়েছিলেন। এরপর তিনি একটি চারচাকার বাষ্পচালিত গাড়ি তৈরি করেন। এরপর প্রায় দশ বছর তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান পেট্রোল ইঞ্জিন নিয়ে। টাকার অসুবিধাও ছিল তাঁর। পরে টাকার ব্যবস্থা করে ১৮৯৯ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর নতুন কোম্পানি 'ওল্ডস মোটর ওয়ার্কস অফ ডেট্রয়েট মিচিগান'। এই নতুন কোম্পানি অনেক নতুন ধরনের মোটরগাড়ি তৈরি করেছিল। তার মধ্যে কিছু-কিছু বিদ্যুতচালিতও ছিল। ১৯০১ সালে এক বিধ্বংসী আগুনে ওল্ডস-এর কারখানা সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। ওই আগুন থেকে যে একটিমাত্র মডেলের গাড়ি বেঁচেছিল, এরপর থেকে (১৯০৩) কোম্পানি সেই গাড়িটিই বানাতে থাকে।

১৮৯৭ থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে বিভিন্ন জ্বালানি ও বিভিন্ন মডেলের গাড়ি তৈরি করতে গাড়ির দুনিয়ায় এসে পড়েন অনেক মানুষ।

এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় গটলেব ডেইমলার নামে এক ইঞ্জিনিয়ারের। তিনি জার্মানির কলোন-এ নিকোলাস-অটোর কারখানায় চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ১৮৮২ সালে ৪৮ বছর বয়সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি নিজের নকশা অনুযায়ী উচ্চগতিবেগ সম্পন্ন হালকা-ইঞ্জিন তৈরি করতে শুরু করেন। এর ৩ বছর পর, ১৮৮৫ সালে তিনি কাঠের ফ্রেমে তৈরি পেট্রোল চালিত একটি মোটরসাইকেল তৈরি করতে সফল হন। এর ঠিক একবছর পর, অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে ডেইমলার তাঁর প্রথম মোটরগাড়ি তৈরি শেষ করেন। ১৮৯৭ সালে ডেইমলারের নকশা অনুযায়ী গাড়ি তৈরির জন্য একটি ব্রিটিশ কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়।

যেহেতু ডেইমলার গাড়ি বেশ বড় এবং আরামদায়ক হতো। ব্রিটিশ রাজপরিবারের খুব পছন্দের গাড়ি ছিল ডেইমলার।

ফ্রান্সিস স্ট্যানলি ও ফ্রিলান স্ট্যানলি নামের পেশায় শিক্ষক দুই যমজ ভাই ১৮৯৭ সালে তৈরি করেন তাঁদের প্রথম বাষ্পচালিত মোটরগাড়ি। প্রথম গাড়িটি বাজারে আসামাত্র এত জনপ্রিয়তা পায় যে তাদের আবিষ্কারের পেটেন্ট এবং কোম্পানি বিক্রি করার জন্য লোভনীয় আর্থিক প্রস্তাব আসতে থাকে। শেষপর্যন্ত তাঁরা বিক্রিও করে দেন তাঁদের কারখানা। নতুন মালিকদের অধীনে ম্যানেজার হিসাবে কিছুদিন কাজ করার পর দুই ভাই একসাথে আবার ব্যবসা শুরু করে, একদম নতুন আরেকটি গাড়ি তৈরি করেন। তাঁদের পুরনো কারখানা আবার কিনে নেন। স্ট্যানলিদের তৈরি গাড়িগুলি বাষ্পচালিত হওয়ায় এদের স্ট্যানলি স্টিমারস্‌ও বলা হতো। ১৯২৫ সাল অবধি স্ট্যানলি স্টিমাররা পেট্রোলচালিত অন্যান্য মোটরগাড়ির সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিয়ে চলেছিল। স্ট্যানলিদের গাড়ি চলত কম খরচে, যথেষ্ট গতিবেগ ছিল তাদের, সহজে সারানো যেত। তবুও এরা লড়াইয়ে হেরে গেল কেন জানো? হেরে গেল এজন্য যে যারা ওইসময়ে গাড়ি কিনত তারা মনে করত এই বাষ্পচালিত গাড়ির বয়লার নির্ঘাত ফেটে যাবে। যদিও এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। আর যে-কারণটা ছিল, সেটা সত্যিই মজার। এই গাড়িগুলো চলত প্রায় নিঃশব্দে, সেদিনের পেট্রোল-গাড়িগুলোর মতো আওয়াজ তুলে যেত না, ফলে পথচারীরাও বুঝতে না-পেরে পথ ছাড়ত না।

ওই ১৮৯৭ সালেই যুক্তরাষ্ট্রের হার্টফোর্ড

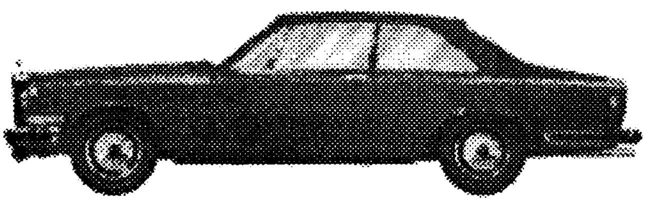

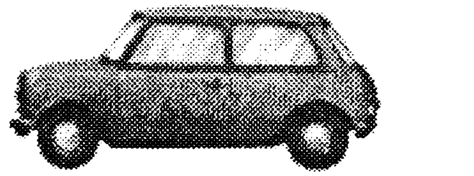

শহরের পোপ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি বাজারে আনে তাদের প্রথম বিদ্যুতচালিত মোটরযান 'কলম্বিয়া ইলেকট্রিক ৪৮'। পরের দুই বছরে তারা অন্তত ৫০০টি বিদ্যুতচালিত গাড়ি তৈরি করে বিক্রি করে। এছাড়া উডস মোটর ভেকল কোম্পানি ১৯০০ সালের আশেপাশে বেশ কয়েকটি সুন্দর ইলেকট্রিক মোটরগাড়ি তৈরি করে। এদের কারখানা ছিল চিকাগোয়।

বিদ্যুতচালিত গাড়িগুলি পরিচ্ছন্ন, আরামদায়ক এবং নিঃশব্দ হতো। কখনও-কখনও উচ্চ গতিবেগ সম্পন্নও। তখনকার পেট্রোল-গাড়িগুলির মতো এদের হাতে করে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে চালু করতে হতো না। এজন্য মহিলাদের মধ্যে ইলেকট্রিক গাড়িগুলি খুবই জনপ্রিয় ছিল।

লুই ও মার্সেল রেনো নামের ফরাসি দুই ভাই ১৮৯৯ সালে তাঁদের প্রথম গাড়ি তৈরি করেন। তাঁরা দুই ভাইই ১৯০৩ সালের 'ভার্সেলেস থেকে মাদ্রিদ' অভিশপ্ত মোটর-রেসে নেমেছিলেন। অন্যান্য বহু চালকের সঙ্গে মার্সেলও মারা যান ওই রেসে। যদিও রেসের পরিচালকরা চিন্তিত হয়ে ফ্রান্সের বর্দো-তে মাঝপথেই রেস থামিয়ে দেন। ছোট করে দেওয়া যাত্রাপথে লুই রেনো ৬৩ মাইল প্রতিঘণ্টা গড়ে তাঁর গাড়ি চালিয়েছিলেন। প্রথম তৈরি গাড়িটি থেকে আজ অবধি রেনো কোম্পানির সব গাড়িরই ইঞ্জিন পিছনে থাকে। রেনোর তৈরি গাড়িতেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তির সৈনিকদের দেওয়া-নেওয়া করা হতো। যে কাজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে করেছিল উইলিস জিপ।

গটলেব ডেইমলারের জার্মান কারখানার উইলহেল্ম মেইব্যাক নামের এক ইঞ্জিনিয়ারের নকশা অনুযায়ী তৈরি প্রথম গাড়িটি ফ্রান্সে প্রদর্শিত হয় ১৯০১ সালে। ফ্রান্সে ডেইমালারের যিনি এজেন্ট, সেই ভদ্রলোক প্রস্তাব দেন যে ওই গাড়িটির নাম তাঁর মেয়ের নাম অনুযায়ী যদি মার্সিডিস রাখা হয় তাহলে ওই কোম্পানির তৈরি সমস্ত গাড়ি তিনি বিক্রি করার দায়িত্ব নেবেন। কোম্পানিও সে প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। প্রথম মার্সিডিস গাড়িটি বিক্রি হয় প্রায় ৩৬০০ ডলারের মতো দামে। মার্সিডিস গাড়ি এত শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় হয়েছিল যে ১৯০৩ সাল নাগাদ মার্সিডিসের দাম গড় ১২০০০ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া সত্ত্বেও বিক্রি ক্রমাগত বেড়েই চলে। বেঞ্জ ও ডেইমলার কোম্পানি ১৯২৬ সালে একত্রিত হয়ে তৈরি হয় 'মার্সিডিস বেঞ্জ'। আর মজার ব্যাপার দেখো আকাশ, যে-জার্মান গাড়ি গত একশতাব্দি যাবৎ তার গুণপনায় মুগ্ধ করে রেখেছে সারা পৃথিবীর মানুষকে সেই গাড়ি আজও বয়ে বেড়াচ্ছে একটি ফরাসি নাম। কী? অদ্ভুত না!

যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানার জন স্টুডিবেকারের কোম্পানি ১৮৯৮ সালে ইলেকট্রিক গাড়ি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ঠিক চার বছর পর, অর্থাৎ ১৯০২ সালে প্রস্তুত করে তাদের প্রথম বিদ্যুতচালিত গাড়ি। যদিও এরই সঙ্গে এবং এরপরও তারা তাদের পুরনো ব্যবসা, অন্য কোম্পানির জন্য গাড়ির বডি তৈরি করা চালিয়ে গেছে। স্টুডিবেকারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করেন রেমন্ড লুই নামের এক বিখ্যাত ডিজাইনার। সে-গাড়ি বাজারে আসে ১৯৪৬ সনে 'স্টুডিবেকার চ্যাম্পিয়ন' নামে।

হেনরি ফোর্ড পেশায় ছিলেন ডেট্রয়েট শহরের মেশিনশপের কর্মী। পরে তিনি এডিসন ইলুমিনেটিং কোম্পানির চিফ ইঞ্জিনিয়ার হন। এরপর তিনি নিজের বাড়ির পিছনের গুদাম ঘরটিতে নানারকম মোটর নিয়ে কাজ করতে-করতে ১৮৯৬ সনে তৈরি করেন তাঁর প্রথম নিজস্ব গাড়ি। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রথম 'ফোর্ড'। মোটে ১৩ জন মানুষ একত্রিত হয়ে মাত্র ২৮০০০ ডলার দিয়ে ১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ফোর্ড মোটর কোম্পানি। প্রথমে তারা বানায় দুসিলিন্ডার ইঞ্জিনের একটি ছোট গাড়ি। ১৯০৬ সালের মধ্যে তারা ৪টি মডেলের গাড়ি তৈরি শুরু করে দেয়। যাদের দাম ছিল ৬০০ ডলার থেকে ২৮০০ ডলারের মধ্যে। ১৯০৭ সালে হেনরি ফোর্ড কোম্পানির পূর্ণ কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে নেন এবং ১৯০৮ সালে রাস্তায় নামে 'মডেল-টি' ফোর্ড। এরপরের ১৮ বছরে মোট দেড় কোটি মডেল-টি তৈরি করা হয়। চাষিরা ভালোবাসতেন এর ওজন বইবার ক্ষমতা, সহজে সারানোর সুবিধা এবং পোস্টে স্পেয়ার পার্টস কেনার সুবিধা। তাছাড়া গাড়ির পিছনদিকটা উঁচু করে দিয়ে একচাকাতে পুলি লাগিয়ে তা দিয়ে করাতকল চালানো যেত, খড়ের বান্ডিল বাঁধা যেত। সবচেয়ে বড় কথা, ক্রেতারা যা চাইতেন, অর্থাৎ সস্তায় নির্ভরযোগ্য একটি গাড়ি—ফোর্ড মডেল-টি তাই ছিল। ১৯২৪ সালেও এ-গাড়ি পাওয়া যেত মাত্র ২৯০ ডলারে।

ডেভিড বুইক নামক এক বাথটব প্রস্তুতকারক ১৯০৩ সালে চমৎকার দেখতে একটি গাড়ি তৈরি করেন। সেটিই ছিল প্রথম 'বুইক'। প্রথম বছরে তিনি মাত্র ৬টি গাড়ি

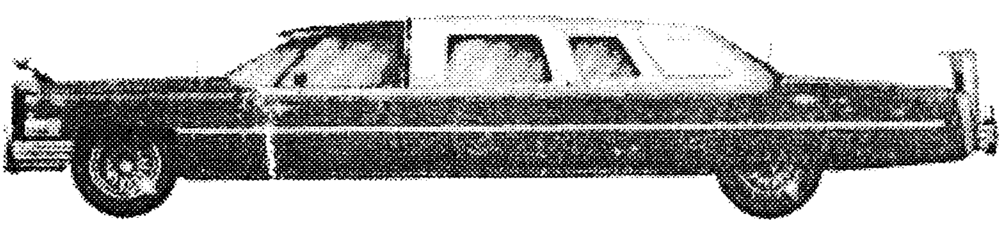

নির্মাণ করতে পেরেছিলেন। ১৯০৮ সালে যখন বুইক কোম্পানি বছরে ৮০০০টির মতো গাড়ি প্রস্তুত করছে, সেইসময় জেনারেল মোটরস 'বুইক' কোম্পানি কিনে নেয়।

এক ইংরেজ লর্ডের ছেলে চার্লস রোলস প্রতিভাবান ইঞ্জিনিয়ার ফ্রেডেরিক হেনরি রয়েসের তৈরি প্রথম গাড়িটি দেখে মুগ্ধ হন। এরপর তিনি দেখা করেন রয়েস-এর সঙ্গে এবং লন্ডনে তাঁর তৈরি সমস্ত গাড়ি বিক্রির দায়িত্ব নিতে সম্মত হন। আর এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে অভিজাত গাড়ির কোম্পানি 'রোলস রয়েস'—১৯০৪ সালে। গল্প আছে, রোলস রয়েস কোম্পানি তাদের গাড়ি তৈরির ব্যাপারে এত খুঁতখুঁতে ছিল যে 'রোলস' কিনতে ইচ্ছুক ক্রেতাকে গাড়ির সমস্ত টাকা জমা করেও গাড়ি পাবার জন্য ৮ বছর অপেক্ষা করতে হতো। কারণ রোলস-এর প্রতিটি ইঞ্জিন 'সিজন' করা হতো ৮ বছর তেলে-জলে-রোদে ফেলে রেখে। যদিও আজও রোলস রয়েস শক্তিশালী এবং বাণিজ্য-সফল বহু গাড়ি বানিয়ে চলেছে, তাদের বিখ্যাততম গাড়িটি হল ১৯০৭ সালে তৈরি রোলস রয়েস 'সিলভার ঘোস্ট'।

নিউইয়র্কের এক সাইকেল প্রস্তুতকারক জর্জ পিয়ার্স ১৯০১ সালে তাঁর তৈরি প্রথম মোটরগাড়িটি বাজারে আনেন। ১৯০৬ থেকে ১৯২০ অবধি অসাধারণ সব গাড়ি বানাতে থাকে তাঁর কোম্পানি 'পিয়ার্স অ্যারো'। ১৯২৮ সালে স্টুডিবেকার কোম্পানি পিয়ার্স অ্যারো কিনে নেয়।

জেনারেল মোটরস-এর প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম দ্যুরাঁ-র অনুরোধে প্রখ্যাত ফরাসি রেস ড্রাইভার লুই শেভ্রলে ১৯১১ সালে একটি গাড়ি তৈরি করেন নিজের নকশা অনুযায়ী। এরপর উইলিয়াম এবং লুই 'শেভ্রলে মোটর কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করে বাজারে বিক্রির জন্য গাড়ি আনেন ১৯১৩ সালে। পরের দুবছরে ১৬,০০০ গাড়ি বিক্রি হয়। ১৯১৯ সালে বাৎসরিক বিক্রিত গাড়ির সংখ্যা পৌঁছায় ১,২৫,০০০-এ। ১৯২৭ সালের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর সর্বাধিক বিক্রিত গাড়ি ছিল শেভ্রলে।

বুইক-এর প্রেসিডেন্ট ওয়াল্টার পি. ক্রাইজলার ১৯২৪ সালে অর্থাভাবে পঙ্গু ম্যাক্সওয়েল কর্পোরেশনকে নিজের অর্থ ঢেলে ক্রাইজলার কর্পোরেশনে পরিণত করেন। এরপর সেই উদ্যমী মানুষটিকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। একে-একে ক্রাইজলারের ছাতার তলায় এসে যায় বুইক, প্লিমাথ, ইম্পিরিয়াল ও ডি সোটো-র মতো গাড়ি।

দ্রুতগামী, সুন্দর দেখতে এবং মজবুত গাড়ির জন্য বুগাটির খ্যাতি। এই গাড়ির নির্মাতা ইত্তোর বুগাটির জন্ম এক শিল্পী পরিবারে। ফ্যাঙ্কো-জার্মান বর্ডারের কাছে তাঁর কারখানায় তৈরি বুগাটি গাড়ি কিনে সোজা মোটর-রেসে নামা এবং জেতা যেত সেইসময়। এতই ভালো এবং দ্রুতগামী সে-গাড়ি ছিল যে ১৯২৫ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে পৃথিবী জুড়ে রেসে মোট ১০০০-এরও বেশি পুরস্কার পেয়েছিল বুগাটি গাড়ি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৪৭ সালে ইত্তোর বুগাটির মৃত্যুর পর অন্যান্য মোটরগাড়ির কোম্পানিগুলি বুগাটিকে লড়াইয়ে পিছনে ফেলে দেয়।

ক্রাইজলার কর্পোরেশন ১৯২৮ সালে প্রথম বাজারে আনে ডি সোটো গাড়ি, যাতে বাজারে প্লিমাথ ও ডজের মাঝামাঝি দামে একটা গাড়ি পাওয়া যায়। সে-গাড়িতে বিরাট কিছু অভিনবত্ব ছিল না। অভিনবত্ব এল ১৯৩৪ সনে। যখন ডি সোটো গাড়িকে ঢেলে সাজানো হল নতুনভাবে। সেই প্রথম দুনিয়ার মানুষ দেখল এয়ার-ফ্লো মডেলের গাড়ি। অর্থাৎ যে-গাড়ি বুকচিতিয়ে কেবল গায়ের জোরে চলবে না, চলবে হাওয়া কেটে। বলা যেতে পারে এইসময়েই মোটরগাড়ি আধুনিক যুগে প্রবেশ করল।

কিন্তু মজার কথা কী জানো আকাশ? মানুষ এই গাড়ি কিনতে আগ্রহী হল না। আর তাই ডি সোটো কোম্পানি আবার ফিরে গেল পুরনো ডিজাইনে। কিন্তু ততদিনে সারা বিশ্ব জুড়ে গাড়ির নির্মাতারা তাদের গাড়ি করতে শুরু করেছে এয়ার-ফ্লো ডিজাইনে।

আকাশ আর আকাশের বাবা যখন গাড়ির গল্পে মশগুল, এসে পড়ে বুম। আকাশের

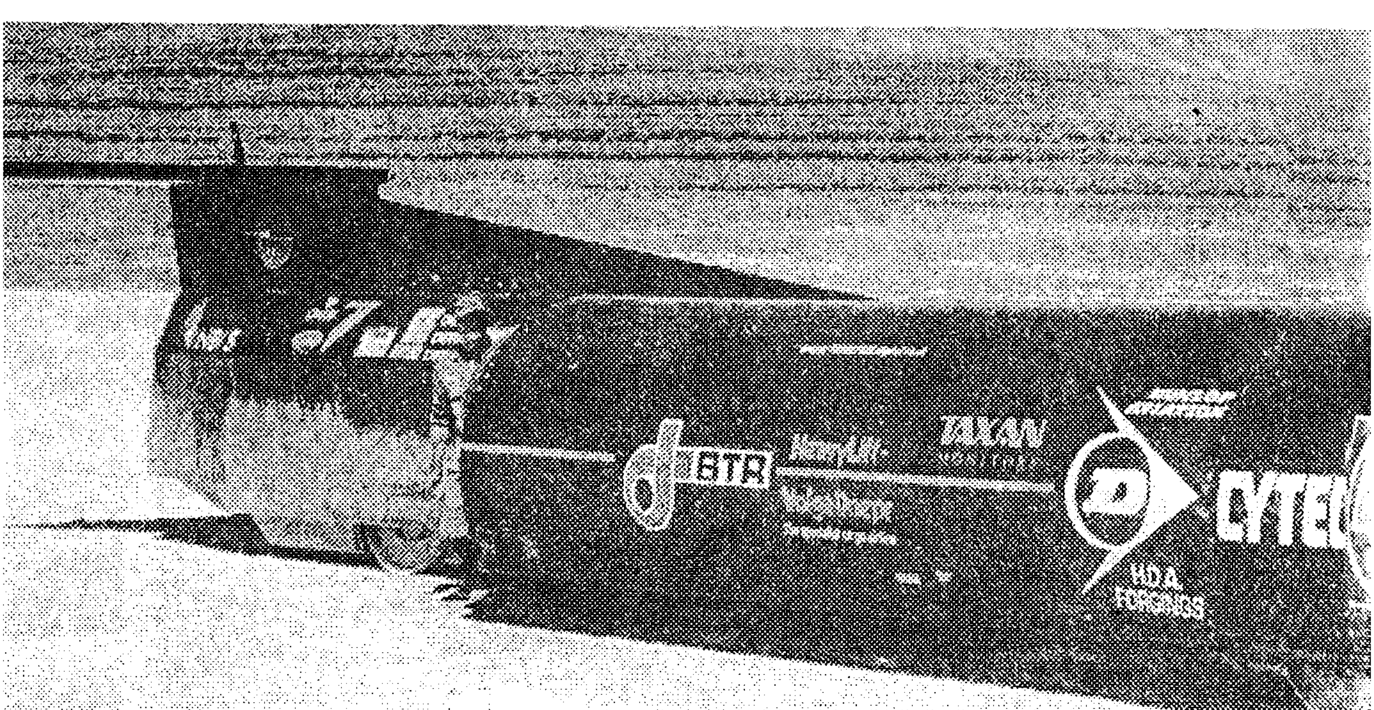

খুড়তুতো দাদা। 'কিসের গল্প হচ্ছে গো?' বুমের প্রশ্ন।

'বাবাকে ধরে এনে গাড়ির গল্প শুনছি রে দাদা।'

'গাড়ি কত রকমের হয় জেঠু?' বুম প্রশ্ন করে। আকাশের বাবা মানে বুমের জেঠু বলেন, 'বেশ তাহলে শোনো' ঃ

জনপ্রিয় গাড়ির কথা

বিভিন্ন সময়ের সবথেকে জনপ্রিয় গাড়িগুলোর কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হবে ফোর্ড মডেল-টি-র কথা। সারা পৃথিবীর মানুষের ভোটে ফোর্ড মডেল-টি 'কার অফ দ্যা সেঞ্চুরি' বা শতাব্দির শ্রেষ্ঠ মোটরগাড়ি নির্বাচিত হয়েছে যে-কারণে তার একটি নিশ্চয়ই এই যে, সেটি খুবই ভালো গাড়ি ছিল। কিন্তু এছাড়াও ফোর্ড মডেল-টি-র ডিজাইন খুবই সহজ ছিল বলে যে কোনও কামারশালাতেও গাড়িটি সারানো যেত। অর্ডার দিলে ডাকে পার্টস কিনতে পারা যেত। তার বড় চাকা এবং মজবুত গড়নের জন্য মডেল-টি আমেরিকার সেইসব প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও পৌঁছে যেতে পারত যেখানে তখনও পাকা রাস্তা পৌঁছয়নি। তবে মোটরগাড়ি শিল্পে মডেল-টি-র সবচেয়ে বড় অবদান বলে যা মনে করা হয় তা হল, ওই গাড়ির স্রষ্টা হেনরি ফোর্ড যেভাবে সমস্ত উৎপাদন প্রক্রিয়াটিই বদলে দিয়েছিলেন। বলা হয় 'ইউরোপিয়ানরা গাড়ি আবিষ্কার করেছিল আর মডেল-টি আবিষ্কার করেছিল গণ উৎপাদন।'

অষ্টিন মোটর কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হার্বার্ট অষ্টিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে উপলব্ধি করেন যে মধ্যবিত্ত মানুষদের জন্য ন্যায্য মূল্যের একটি ছোট গাড়ি তৈরি করতে পারলে তার বিরাট বাজার আছে। ওই কাজে হাত দিয়ে তিনি তৈরি করেন ৭ অশ্বশক্তির একটি ছোট মোটরগাড়ি। নাম দেন অষ্টিন সেভেন। ১৯২২ সালে বাজারে এসে সে-গাড়ি দারুণ জনপ্রিয়তা পায় এবং সামান্য রদবদল করে তৈরি হতে থাকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত। আজও এত জনপ্রিয় সে-গাড়ি যে সারা বিশ্বে, এমনকি ভারতবর্ষেও তার ফ্যান ক্লাব আছে।

আর-একটি জনপ্রিয় মোটরগাড়ি হল ফিয়াট টোপোলিনো। ফিয়াট এই গাড়ির উৎপাদন চালিয়ে গিয়েছিল ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত—কেবল এর জনপ্রিয়তার কারণে। ৫৭০ সি.সি.-র এই ছোট্ট ইতালিয় গাড়িটির স্রষ্টা ছিলেন দান্তে গায়াকোসা নামের এক প্রতিভাবান ইঞ্জিনিয়ার। সরল, হাল্কা গড়ন এবং নির্ভরযোগ্যতা ছাড়াও কম জ্বালানিতে চালানো যেত এই গাড়ি। ফলে এই গাড়ি এত জনপ্রিয় হয় যে কেবল শহর নয়, ইতালির গ্রামগঞ্জও ছেয়ে যায় টোপোলিনোতে। আর হ্যাঁ, এইসঙ্গে জেনে রাখা ভালো যে মিকি মাউসের ইতালিয় প্রতিশব্দ হল টোপোলিনো।

তর্ক সাপেক্ষে পৃথিবীর সবথেকে জনপ্রিয় মোটরগাড়ি ভক্স ওয়াগান 'বিটল', তৈরি হয়েছিল হিটলারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই। হিটলারের স্বপ্ন ছিল জার্মানির জন্য একটি জনতার গাড়ি। এই স্বপ্ন বা ইচ্ছাকেই রূপ দিয়েছিলেন ফার্দিনান্দ পরস্চে। তখনই এ- গাড়ি দারুণ জনপ্রিয় হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিজেতা মিত্রশক্তি ওই গাড়ি আর বানাতে দিতে চায়নি। তাই গুবরে পোকার মতো চেহারার চারসিটের এই অসামান্য গাড়িটির পুনরুদ্ধার এবং পুনরুত্থানের দায়িত্ব নেয় জার্মানরাই এবং সফলভাবে উৎপাদনে ফিরিয়ে আনে 'বিটল'-কে। সে-গাড়ি দুনিয়া জুড়ে এত পরিচিত এবং প্রিয় যে দ্বিতীয়বার ১৯৪৬ সালে উৎপাদনে ফিরে আসার পর আজও 'বিটল' তৈরি এবং বিক্রি হচ্ছে বহু দেশে।

ফ্রান্সের সিট্রোয়েন কোম্পানি ১৯৪৮ সালে বিক্রি শুরু করে তাদের সিট্রোয়েন টু-সি. ভি. মডেলের। যদিও এর নকশার কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। কোম্পানির মালিক বুঝেছিলেন যে ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে চাষিদের নিজেদের ব্যবহার এবং খামারের উৎপাদন বয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন একটি ছোট গাড়ির। তাই তিনি তাঁর ইঞ্জিনিয়ারদের বলেন,

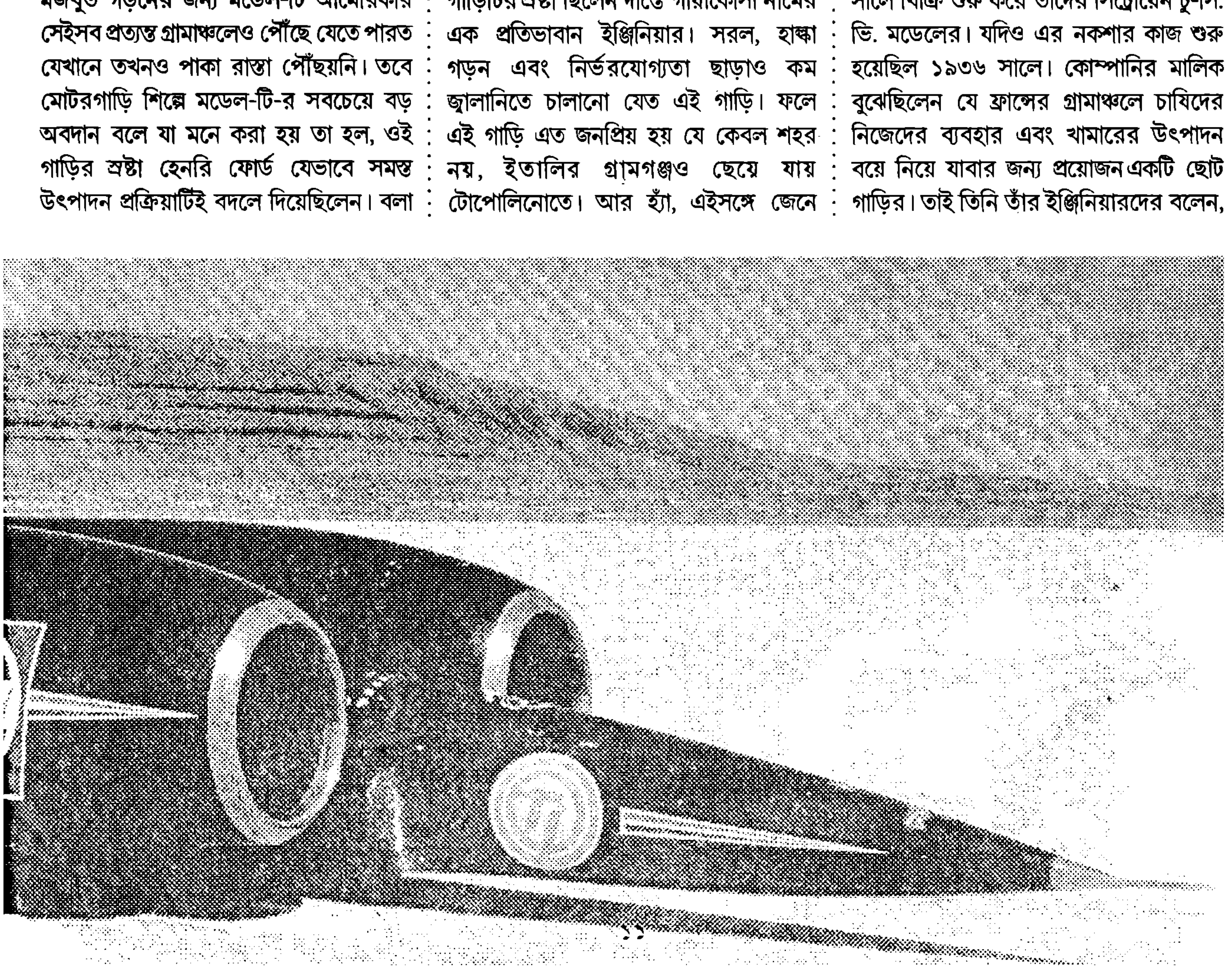

'আমার একটা এমন গাড়ি চাই যেটা হাল-চষা জমির উপর দিয়ে একবাক্স ডিম নিয়ে নির্বিঘ্নে চলে যেতে পারবে।' তাঁর ইঞ্জিনিয়াররাও সেই মতো লেগে যান সে-রকম একটা গাড়ি তৈরি করতে। কথা ছিল ১৯৩৯ সালের প্যারিস মোটর শো-এ গাড়িটি প্রথম দেখানো হবে। কিন্তু এরমধ্যে এসে যায় বিশ্বযুদ্ধ। তবে জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সেও জার্মান ফৌজের চোখের আড়ালে চলতে থাকে গাড়ি তৈরির কাজ। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮ সালে বাজারে আসে কাঙ্খিত গাড়িটি। যুদ্ধবিধ্বস্ত, অর্থাভাবে প্রায় পঙ্গু ফ্রান্সে এই ছোট্ট, সরল অথচ মজবুত এবং মিতব্যয়ী গাড়িটি দারুণ জনপ্রিয়তা পায়। এতটাই যে সিট্রোয়েন টু-সি. ভি. ১৯৯০ সাল পর্যন্ত উৎপাদিত হতো।

১৯৫৯ বিশ্বের বাজারে অষ্টিন মিনি এসে পড়ার আগে পর্যন্ত মানুষ ছোট গাড়িতে ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভের কথা ভাবতেই পারত না। ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ মানে বোঝ তো বুম? ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ অর্থাৎ যে গাড়ির সামনের দুচাকা ঘুরে পিছনের চাকা দুটিকে ঘোরায়। মানে আজকের মারুতি গাড়ির মতো। আর সেই অর্থে অষ্টিন মিনিকে পৃথিবীর প্রথম আধুনিক ছোট গাড়ি বলা যায়। স্যার আলেক ইসিগোনিসের তৈরি এই গাড়ি চড়ার যেমন মজা ছিল, তেমনি একে চালানোর খরচও ছিল খুব কম। ফলে খুব তাড়াতাড়ি এই গাড়ি মানুষের ভালোবাসা আদায় করে নিয়েছিল। আর তাই ১৯৭৮ সালে অবধি এর বিক্রির সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৪৫,০০০০০-এর মতো। আজও অষ্টিন মিনি উৎপাদিত হচ্ছে। কে জানে আজ অবধি তার উৎপাদন সংখ্যা কত হল!

যেহেতু নির্মিত বা বিক্রিত গাড়ির সংখ্যাই জনপ্রিয়তার মাপকাঠি, তাই যে গাড়িটির কথা না-বললেই নয়, সেটি হল উইলিস জিপ। এই গাড়ি একেবারেই যুদ্ধের প্রয়োজনে সৃষ্ট বা যুদ্ধ উপজাত বলা যায়। সেইসময় যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া-আসার জন্য একটি সহজ, সরল কিন্তু মজবুত ও যে কোনও পথে চলতে সক্ষম এমন গাড়ির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ফোর হুইল ড্রাইভ বা চারচাকাই ঘোরে, এমন গাড়ি সেই প্রথম তৈরি হল। কেবল ফ্রন্ট হুইল বা রিয়ার হুইল না-হয়ে ফোর হুইল ড্রাইভ গাড়ি হওয়ায় জিপ পাহাড়ে বা খাদে, মরুভূমিতে বা কাদায় সহজেই যেতে পারত। যা আর কোনও গাড়ির পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে জিপ তৈরি হল হাজারে-হাজারে এবং ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত এমন কোনও রণক্ষেত্র নেই যেখানে কাজ করেনি উইলিস জিপ।

যাক, এই হল মোটামুটিভাবে গত একশতাব্দির জনপ্রিয় গাড়িদের কথা।

'কিন্তু স্পিড, জেঠু? সবচেয়ে স্পিডে যায় কোন গাড়ি?' বুম জিগ্যেস করে।

আকাশ বলে, 'হ্যাঁ বাবা, সবচেয়ে জোরে দৌড়ায় যে-গাড়ি তার কথাও বলো'।

আকাশের বাবা বলেন, "দেখো বাপু তোমরা যদি কেবল স্পিডের কথা বলো তাহলে বলতে হবে যে তারও ভাগ আছে কয়েকটা। যেমন কেবল রাস্তা দিয়ে যায় যে-গাড়ি তাদের মধ্যে সবথেকে দ্রুত কে? মোটর রেসে যে-সব গাড়ি দৌড়োয় তাদের মধ্যে গতিবেগ কার সবচেয়ে বেশি? এবং সর্বোপরি ডাঙায় বা মাটিতে বিশ্বের দ্রুততম গাড়ির গতিবেগের রেকর্ড কী?

যদি গতিবেগকেই শেষ কথা ধরো, তাহলে শেষেরটিই অর্থাৎ ডাঙায় পৃথিবীর সেরা স্পিড রেকর্ডটির কথাই ধরতে হবে। তাহলে এবার আমরা শুনব।"

সবচেয়ে জোরে যায় যে-গাড়ি

চিরাচরিত প্রথায় প্রস্তুত গাড়ি নিয়ে ৬৯০.৯ কি.মি. প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে পৌঁছে বিশ্ব রেকর্ড করেন ডোনাল্ড ম্যালকম ক্যাম্পবেল নামের এক ইংরেজ ড্রাইভার। দিনটি ছিল ১৯৬৪ সালের ১৭ই জুলাই। যে-গাড়ি নিয়ে তিনি বিশ্বরেকর্ড করেন সেই ৩০ ফুট লম্বা ৪,৩৫৪ কেজি ওজনের গাড়িটির নাম ছিল 'ব্লু বার্ড'। আর এই রেকর্ড তিনি করেন দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার আয়ার হ্রদের পাশে সল্ট ফ্ল্যাটে। ব্লু বার্ডের ইঞ্জিনের ক্ষমতা ছিল ৪,৫০০ অশ্বশক্তিরও বেশি। ডোনাল্ড ক্যাম্পবেলের এই সাফল্যে ব্রিটিশরা এত গর্বিত হয় যে তাঁকে দেওয়া হয় গ্রেট ব্রিটেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্মান সি. বি. ই. অর্থাৎ 'ক্রস অফ ব্রিটিশ এম্পায়ার'।

এরপরের বছরই, অর্থাৎ ১৯৬৫ সালের ১৫ই নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের উটাহ প্রদেশের বোনেভিল সল্ট ফ্ল্যাটে ৯৮৮.১ কি.মি. প্রতি ঘণ্টা গতিতে একটি জেট ইঞ্জিনযুক্ত গাড়ি চালিয়ে ক্যাম্পবেলের রেকর্ড চূর্ণ করে দেন নর্মান ক্রেগ ব্রিডলাভ নামের এক আমেরিকান ড্রাইভার। গাড়িটির নাম ছিল 'স্পিরিট অফ আমেরিকা-সোনিক-১'। গাড়িটির দৈর্ঘ্য ছিল ৩৪ ফুট ৭ ইঞ্চি এবং ওজন ছিল ৪,০৮০ কেজি। গাড়িটিকে শক্তি যুগিয়েছিল জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির একটি জে ৭৯, জি. ই.-৩ জেট ইঞ্জিন।

এই রেকর্ডও ভেঙে যায় ১৯৭০ সালে। ১৯৭০ সালের ২৩শে অক্টোবর 'দ্যা ব্লু ফ্লেম' নামে রকেট ইঞ্জিনচালিত চারচাকার একটি গাড়ি নিয়ে ১০১৬ কি.মি. প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে চালিয়ে আগের রেকর্ডও ভেঙে দেন গ্যারি গ্যাবেলিচ নামের এক আমেরিকান। এই রেকর্ডও তৈরি হয় উটাহ-র বোনেভিল সল্ট ফ্ল্যাটে। রকেট ইঞ্জিনটির জ্বালানি ছিল স্বাভাবিক গ্যাস ও হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড।

১৯৯৭ সালের ১৩ই অক্টোবর স্বয়ংক্রিয় স্থলযানের বিশ্বরেকর্ড আবার ভেঙে দেয় ব্রিটিশরা। শুধু নতুন গতিবেগের রেকর্ড করাই নয়, এই প্রথম শব্দের গতিবেগের চেয়েও দ্রুতবেগে, অর্থাৎ প্রায় ১২২০.৮ কি.মি. প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে কোনও স্থলযান চালাতে সক্ষম

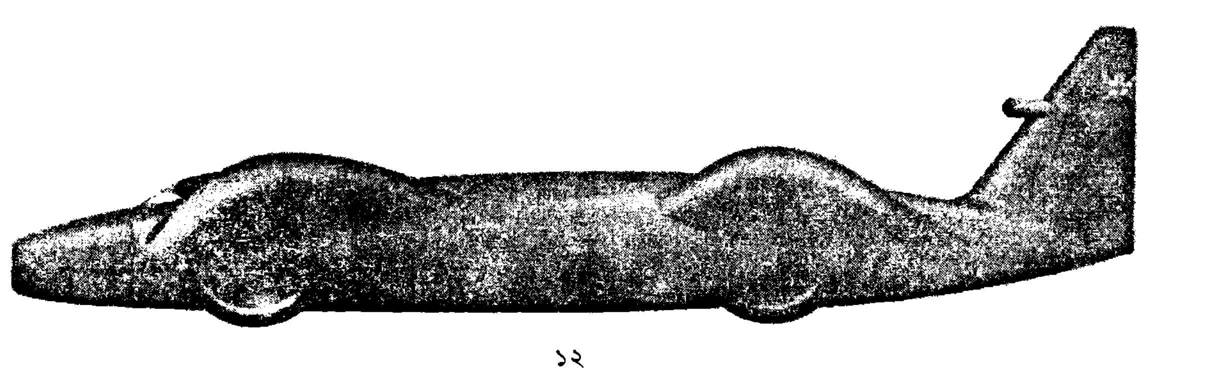

হল মানুষ। যে গাড়িটির সাহায্যে শব্দসীমাকে অতিক্রম করল মানুষ, তার নাম 'থ্রাস্ট এস. এস. সি.'—বা থ্রাস্ট সুপার সনিক কার। এই গাড়িটির স্বপ্ন দেখা থেকে রূপায়িত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন রিচার্ড নোবল নামের এক ব্রিটিশ রেস ড্রাইভার। এর আগের রেকর্ডটিও ছিল তাঁরই করা থ্রাস্ট-২ নামক গাড়িতে। এ-গাড়িটিও চালানোর কথা ছিল তাঁরই। কিন্তু তিনি শেষপর্যন্ত ড্রাইভারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন এই কারণে যে, শব্দের সমান বা তার থেকে বেশি গতিবেগের কিছু চালানোর কোনও অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। সেই জায়গায় অনেক বাছাবাছির পর তিনি দায়িত্ব দেন অ্যান্ডি গ্রীন নামক রয়্যাল এয়ারফোর্সের এক পাইলটকে। অ্যান্ডি গ্রীন খুব সাফল্যের সঙ্গে ডাঙায় চালানো প্রায় মিসাইল গড়নের গাড়িটি নিয়ে পেরিয়ে যান শব্দসীমা, করেন নতুন বিশ্বরেকর্ড। ১০টন ওজনের এই গাড়িটিকে চালাতে ব্যবহার করা হয় দুপাশে দুটি রোলস রয়েস স্পে ২০৫ ইঞ্জিন। যার এক-একটির শক্তি ৫০,০০০ ব্রিটিশ হর্স পাওয়ার।

এত গেল সবচেয়ে জোরে যায় যে গাড়ি তাদের কথা। এবার বলো তো আকাশ, বুম তোমাদের জানতে ইচ্ছে করেনা যে-গাড়ি আকাশেও চলতে পারে তার কথা?

'সেকিগো জেঠু, গাড়ি আবার আকাশে ওড়ে নাকি?' বুমের প্রশ্ন। আকাশ বলে, 'বাবা, আকাশে তো এরোপ্লেন ওড়ে। গাড়ি আবার ওড়ে নাকি?'

'হ্যাঁ বাবা ওড়ে', আকাশের বাবা বলেন। 'তবে শোনো এবার, যে-গাড়ি আকাশেও যায় তার কথা'।

গাড়িরা হয় কতরকম

গাড়ি প্রধানত হয় সেডান, সেলুন, লিমো বা লিমুজিন, কুপে, রোডস্টার ও জিপ—এই কটি চেহারা বা ধরনের। তবে গাড়ির যত বিবর্তন হচ্ছে, ততই তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন রকম আলাদা ব্যবহারের জন্য গাড়ি। এবার শোনো সেডান কাকে বলে, লিমুজিনই বা কোন গাড়ি, জিপ কী কাজে লাগে ইত্যাদি কথা।

'ছড়ায় বলতে হবে কিন্তু' বুম বলে। সে জানে তার জেঠু অনেক কিছুই ছড়ায় বলে। এইতো এবছর রাজ্য শ্যুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে বুম ফার্স্ট হতে পারেনি গত বছরের মতো।

সেকেন্ড হয়ে সিলভার মেডেল পেয়েছে। জেঠু সঙ্গে-সঙ্গে বলল

'শপথ ভীষণ বোল্ড চাই
টেম্পারামেন্ট কোল্ড চাই
বুলস্ আই-এ হোল্ড চাই
পরের বছর গোল্ড চাই"।

বুমের কথা রাখতে জেঠু বলেন 'বেশ তবে ছড়াতেই শোনো ঃ

ক্যাব্রিওলে বা রোডস্টার
লাগবে চুলে ঝোড়ো হাওয়া
পিঠে রোদের তাপ
ছুটবে গাড়ি ঝড়ের গতি
কাটবে মনের চাপ
আগে বলত কনভার্টিবল্
এখন বলে ক্যাব্রিওলে
অন্য সময় খোলা মাথা
বৃষ্টি হলে হুডটা তোলে।'

'আর সেডান?' আকাশ জিগ্যেস করে। বলছি ঃ

সেডান
সামনে থাকবে বনেট
এবং পিছন দিকে ডিকি
ইচ্ছে হলে লাগাও একটা
এরিয়ালে টিকি

দুই চাকারই মধ্যে
দুসার বসার সীট
গরম লাগলে করো
এয়ার কুলার ফিট

একেই মোটামুটি সবাই
সেডান বলি
তেলের ট্যাঙ্কি ভর্তি হলে
সটান চলি'

'কুপে কাকে বলে, কুপে?' এবার বুম।

কুপে
চড়ার কেবল দুখানি সিট
মাথায় ধাতব ঢাকা
ছোটাও গাড়ি বেদম জোরে
রাস্তা পেলে ফাঁকা

'কুপে' নামের গাড়ি চড়েন
যাঁরা ভাগ্যবান
তিনটি লোকের ঠাঁই হবে না
এমন চক্রযান!

'উইক-এন্ড বা এস্টেট কোন গাড়িকে বলে শোনো' বুমের জেঠু বলেন।

উইক এন্ড বা এস্টেট
উইক এন্ডটা আর কিছু নয়
নামের ফের
এস্টেটেরই সহোদর সে
মিলতো ঢের!

'এখনও কিন্তু জিপ আর লিমুজিন বাকি' আকাশের কথা শুনে তার বাবা বলেন, ছড়া কি এত তাড়াতাড়ি বানানো যায় বাবা, বলছি একটা-একটা করে।

জিপ
ভাঙা পথের রাঙা ধুলোয়
দৌড়ায় যে গাড়ি
পিচ বাঁধানো সড়ক পথেও
যায় সে তাড়াতাড়ি
যুদ্ধে লাগে, ত্রাণের কাজেও
মন্বন্তর, মারির মাঝেও
নির্ভীক বীর লড়াই চালায়
খুব সাধারণ সাজেও!

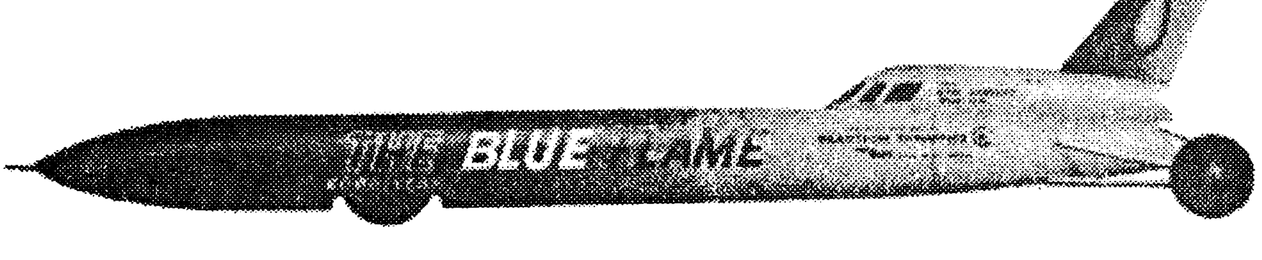

লিমুজিন

'লিমুজিনের চলতে হলে
রাস্তা লাগে চওড়া
হোকনা সেটা কলকাতা বা
হুগলি কিম্বা হাওড়া

গোটা ছয়েক দরজাওয়ালা
ইয়া লম্বা গাড়ি
মুখোমুখি দুসারি সিট
আড্ডাসহ গাড়ি

ড্রাইভারের জন্য আছে
পৃথক একটি আসন
সিটে বসেই দেখতে পার
রঙিন টেলিভিশন

গর্তে পড়লে মনে হবে
আস্তে দিচ্ছে দোল কে
সিটে বসে দুধ যদি খাও
পড়বে না তা চলকে!'

গাড়ি যায় আকাশেও

আজ থেকে বহুদিন আগে ১৯৪০ সালে ফোর্ডমোটর কোম্পানির চেয়ারম্যান হেনরি ফোর্ড এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন,—'তোমরা লিখে রাখতে পার আমার কথা যে অদূর ভবিষ্যতে এমন একটা মোটরগাড়ি আসছে যে-গাড়ি আকাশে উড়তে পারবে। এখন হয়তো অনেকেই হাসছ আমার কথায়, কিন্তু জেনো এ-শুধু সময়ের অপেক্ষা।'

এটা ২০০২ সাল আর তৈরি হয়ে গেছে সেই স্বপ্নের গাড়ি 'মোলার-৪০০' বা 'স্কাই কার'। যাকে আমরা 'আকাশ গাড়ি' বলতে পারি বাংলায়।

এই গাড়ি হেলিকপ্টারের মতো মাটি থেকে খাড়াভাবে আকাশে উড়তে পারে। আর নামতেও পারে খাড়াভাবে। ছোট জেট বিমানের গতিতে উড়ে যেতে পারে আকাশপথে। নির্ভরযোগ্যতা, নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য্য যার লাক্সারি বা দামি গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো অথচ চালাতে হলে এরোপ্লেনের পাইলটের মতো দক্ষতা লাগে না। সাধারণ মোটরগাড়ি চালাবার যোগ্যতা থাকলেই যথেষ্ট।

অফিস যাবার আগে নিজের গ্যারেজে গিয়ে মোলার-৪০০-র কি-প্যাডে বুড়ো আঙুল ছোঁয়ালেই ভিতরের মনিটর চেক করে নেবে তোমার বুড়ো আঙুলের ছাপ, আস্তে-আস্তে খুলে যাবে বসার সীটের উপরের কাচের ঢাকনা বা ক্যানোপি। উঠে বসে আরেকটা বোতাম টিপলেই গাড়ির নিজস্ব তিনটি কম্পিউটার চেক করতে থাকবে ফুয়েল লেভেল বা কতটা তেল আছে, প্রেসার, ব্যাটারি, ইগ্নিশান ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যাপার। ছোট্ট একটি সুইচ অন করলেই নিঃশব্দে চালু হয়ে যাবে গাড়ির আটটি রোটারি ইঞ্জিন। কম্পিউটার আবার নিজে থেকে চেক করতে থাকবে ইঞ্জিন টেম্পারেচার, ওড়ার আগে প্রয়োজনীয় পাওয়ার লেভেল বা শক্তিতে ইঞ্জিন পৌঁছেছে কিনা। এরপর আস্তে-আস্তে গড়িয়ে গাড়িকে নিয়ে এসো গ্যারেজের বাইরে। এবার থ্রটল-এ সামান্য

চাপ দিলেই তোমার গাড়ি মাটি থেকে ১ মিটার উপরে। এবার জয় স্টিক ঠেলে দাও সামনে দিকে, সামান্য। গাড়ি সামনে এগোতে থাকবে ইঞ্জিনের ৬৫ শতাংশ শক্তি ব্যবহার করে। এবার কন্ট্রোল চলে যাবে তোমার হাত থেকে কম্পিউটারের হাতে। সে তোমাকে নিয়ে যাবে তোমার অফিসের ভার্টিপোর্ট বা যেখানে স্কাইকার নামে সেই মুখো তোমার জন্য নির্দিষ্ট আকাশ-সড়ক (এয়ার করিডর) দিয়ে।

ফ্লাইট মনিটরের দিকে চোখ ফেরালেই দেখতে পাবে গাড়ি চলেছে ৩০০ কি.মি. প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে এবং ১৫০০ মিটার প্রতি মিনিট হিসাবে উঁচুতে উঠছে। অর্থাৎ উড়ান শুরু করার ১ মিনিটের মধ্যে তুমি যানজটে আটকে যাওয়া হাইওয়ের দেড় কিলোমিটার উপর দিয়ে শহুরে গাড়ির প্রায় দশগুণ গতিতে যাত্রা করছ।

আগামী পৃথিবীর গাড়ি আজ আমাদের সামনে। স্বাগত।

হেনরি ফোর্ড ১৯৪০ সালে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেই পথ ধরেই স্বপ্ন দেখা শুরু হয় ১৯৬২ সাল থেকেই। যখন প্রথমবারের জন্য একটি 'ভার্টিকাল টেক অফ অ্যান্ড ল্যান্ডিং ক্রাফ্‌ট' বা খাড়াভাবে ওঠা-নামা করতে পারে এমন আকাশযানের (হেলিকপ্টারকে বাদ দিয়ে) মডেল তৈরি হয়। অর্থাৎ রোটারি ইঞ্জিন-এর ব্যবহার হয়। যে-ইঞ্জিন ব্যবহার করে যানটি প্রথমে মাটি ছেড়ে উঠবে তারপর সেই ইঞ্জিনই ঘুরে গিয়ে নিচের দিকের বদলে পিছনের দিকে চাপ দেবে এবং ওই যান আকাশপথে ছুটবে।

যদিও আজকের মোলার-৪০০ বা 'আকাশগাড়ি'-র স্রষ্টা ডঃ পল মোলার এই গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন ১৯৬৮ সালেই, তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার এই চেষ্টা গতি পায় ১৯৮২ সালের পর। কারণ ওই সময়ের আগে তৈরি স্কাইকার-এর মডেলগুলির ওজন ও শক্তির অনুপাত ঠিক ছিল না। অর্থাৎ ইঞ্জিনের উৎপাদিত শক্তির তুলনায় গাড়ির ওজন বেশি ছিল। ফলে সেই সব গাড়ির উড়ান-ক্ষমতা সীমিত ছিল। ১৯৮২ থেকে টানা একদশকেরও বেশি সময়ের চেষ্টায় ১৯৯২ সালে ডঃ পল মোলার তাঁর স্কাইকারের আবিষ্কারের পেটেন্ট পান। আর তার ঠিক দশ বছর পর ২০০২ সালে স্কাইকার বা 'আকাশগাড়ি' বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য প্রায় তৈরি।

৫৩০ সি. সি.-র ৮টি রোটা পাওয়ার ইঞ্জিনে চালিত এই গাড়ির গড় গতিবেগ ৫৬০ কি.মি. প্রতি ঘণ্টা এবং আকাশপথে সর্বোচ্চ গতিবেগ ৬২৪ কি.মি. প্রতি ঘণ্টা। ৩৩৬ কে.জি.-র উপর বহনক্ষম এই যানের ছোট ওজন ১০৯১ কে.জি.। জ্বালানির খরচ ৫.৩৯ কি.মি. প্রতি লিটারে। এই গাড়ি আকাশে ৩৩৭৮ মিটার প্রতি মিনিট হিসাবে উঁচুতে উঠতে পারে। ৯১৪৬ মিটার অবধি উচ্চতায় ঘোরাফেরা করতে পারে। ৯৬০ ব্রিটিশ অশ্বশক্তির ইঞ্জিনের এই আকাশযান ১০.৬৭ মি. ব্যাসের যে কোনও জায়গা থেকে ওঠা-নামা করতে পারে। চালু থাকাকালীন ৬৫ ডেসিবেলের চেয়েও কম শব্দ করে এবং সবচেয়ে বড় কথা—পেট্রোল, ডিজেল,

প্রাকৃতিক গ্যাস বা অ্যালকোহল যে কোনও জ্বালানিতে চালানো যায় কার্বুরেটারে সামান্য অদলবদল ঘটিয়ে।

স্কাইকারের নিরাপত্তার দিকটিও খুব খুঁটিয়ে ভাবা হয়েছে এবং ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। যেমন স্কাইকারের মোট ৮টি ইঞ্জিনের মধ্যে ১টি বা ২টি উড়ন্ত অবস্থায় বিকল হয়ে গেলেও অনায়াসে সে-গাড়ি নিয়ে মাটিতে নামা যাবে। এমনকি যদি একই সঙ্গে সবকটি ইঞ্জিন গোলমাল করে বা কোনও বড়রকমের গোলযোগ হয় কোনও যন্ত্রাংশে—দুটি বিশেষ প্যারাস্যুট দিয়ে নিরাপদে পাইলট, যাত্রী ও গাড়িটিকে মাটিতে নামিয়ে আনা যাবে। এছাড়া হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন বা জোরালো ঝড় উঠলে সহজেই যে কোনও জায়গায় নামিয়ে ফেলা যাবে স্কাইকারকে। কারণ তোমরা আগেই জেনেছ যে স্কাইকারের নামার জন্য খুবই কম জায়গা লাগে।

আর জানো কী বুম যে, বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হলে বাজারে এই আকাশগাড়ি কী দামে পাওয়া যাবে? মাত্র ১,০০০০০ মার্কিন ডলারে। এমনকি ডঃ পল মোলার মনে করছেন বেশি বিক্রি হলে তিনি এই দাম ৮০,০০০ ডলারের মধ্যে নামিয়ে আনতে পারবেন।

যাই হোক, এই হল যে, গাড়ি আকাশেও যায় তার কথা। আর অন্য গাড়িদের কথাও তো অনেক হল। আজ এই পর্যন্তই থাক। আকাশ, বুম তোমাদের মায়েরাও ডেকে গেছেন অনেক্ষণ আগে। এবার গিয়ে তোমরা স্নান-খাওয়া করো।' এই বলে থামেন বুমের জেঠু এবং আকাশের বাবা—আলোকবাবু। কিন্তু থামতে চাইলেই কী থামা যায়! দুই ভাইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, 'আরেকটু বলো আরেকটু বলো, স্নান করতে পরে যাব' বলে।

বেশ তবে আরও কয়েকটা ছোট-ছোট খবর জেনে রাখো মোটরগাড়ির ব্যাপারে। যেমন পৃথিবীর সবথেকে দামি গণ-উৎপাদিত গাড়ি হল 'রোলস রয়েস ক্যামারগ'। ১৯৮০ সালেই যার দাম ছিল ৪৭,৩৬৭ পাউন্ড।

আরও বিশেষভাবে তৈরি গাড়ির মধ্যে সবচেয়ে বেশি দামি গাড়িটি হল ১৯৬৯ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের জন্য তৈরি লিঙ্কন কন্টিনেন্টাল এক্সিকিউটিভ। সে-গাড়ির দৈর্ঘ্য ২১ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং ওজন ৫.৩৫ টন। যার মধ্যে ইস্পাতের পাতই ছিল, ২ টন। সে-গাড়ি এমনভাবে তৈরি যাতে গুলি করে চারটি টায়ারই ফাটিয়ে দিলেও রিমের সঙ্গে লাগানো রাবারের জোরেই ৮০ কি.মি. প্রতি ঘণ্টা গতিতে ছুটতে পারে। আর এইসব করতে খরচও পড়েছিল ঢের। সেই সময়েই ৫,০০০০০ মার্কিন ডলার।

জেনে রাখো দুনিয়ার সবচেয়ে শস্তা গাড়িটার কথাও। সে-গাড়িটি হল ১৯১৬-১৯১৯ সাল এ. ও. স্মিথ কর্পোরেশন মিলওয়াকি, উইসকনশিন-এর তৈরি ১.৫ অশ্বশক্তির স্মিথ ফ্লায়ার। যার দাম ছিল মাত্র ১৪০ মার্কিন ডলার।

অটোমোবাইল ক্লাব অফ আমেরিকা ইনকর্পোরেটেড-এর প্রেসিডেন্ট লিও ওয়াইজারের জন্য বিশেষভাবে তৈরি ক্যাডিলাকটি বিশ্বের দীর্ঘতম গাড়ি। ১৯৭৬ সালে তৈরি এই গাড়িটির দৈর্ঘ্য ২৬ ফুট ৭ ইঞ্চি ওজন ৪০৮০ কেজি। বিরাট দৈর্ঘ্যের জন্য গাড়িটিকে 'স্ট্রেচড ক্যাডিলাক'ও বলা হয়। এই গাড়িতে রয়েছে একটি ঘূর্ণায়মান খাট, টেলিভিশন, ফ্রিজ, স্টিরিও, টেলিফোন, বার, ভিডিও টেপ রেকর্ডার এবং চুরি প্রতিরোধক ব্যবস্থা।

এছাড়াও মোটরগাড়ি অনুপ্রাণিত করেছে অসংখ্য লেখক, শিল্পী, এবং বিভিন্ন পেশার মানুষকেও। আর তাই তারাশংকরের লেখায় আমরা পাই অভিযানের মতো গল্প। ঋত্বিক ঘটক সিনেমা করেন 'অযান্ত্রিক'। যেখানে একটা গাড়িই রয়েছে মুখ্য চরিত্রে। এছাড়া ব্যাটম্যানের গাড়ি 'ব্যাট মোবাইল', জেমসবন্ডের গাড়ি এসব তো তোমরা সিনেমায় দেখেইছ।

আসলে কী জানো, গাড়ি ভালো লাগা বা ভালোবাসা আমাদের মনের মধ্যে তৈরি হয় নানা কারণে। কারুর ভালো লাগে তার গতি আবার কারুর ভালো লাগে স্বাধীনভাবে চলার সুবিধা। তবে কারণ যাই হোক, গাড়িকে ভালোবাসে যারা, তারা অনেক কিছুই ছাড়তে পারে গাড়ির জন্য। এ-ব্যাপারে আমাদের ছোটবেলার একটা গান মনে পড়ে যাচ্ছে। সেটা দিয়েই আজ শেষ করা যাক।

"হাওয়া গাড়ি ঝমঝম লিচুবাগানে
যা ছিল সব গেল তোমা কারণে
অ্যান্ড হাওয়া গাড়ি..."

আরব্য রজনীর গল্প

চিত্রনাট্য ও ছবি **অমর মজুমদার**

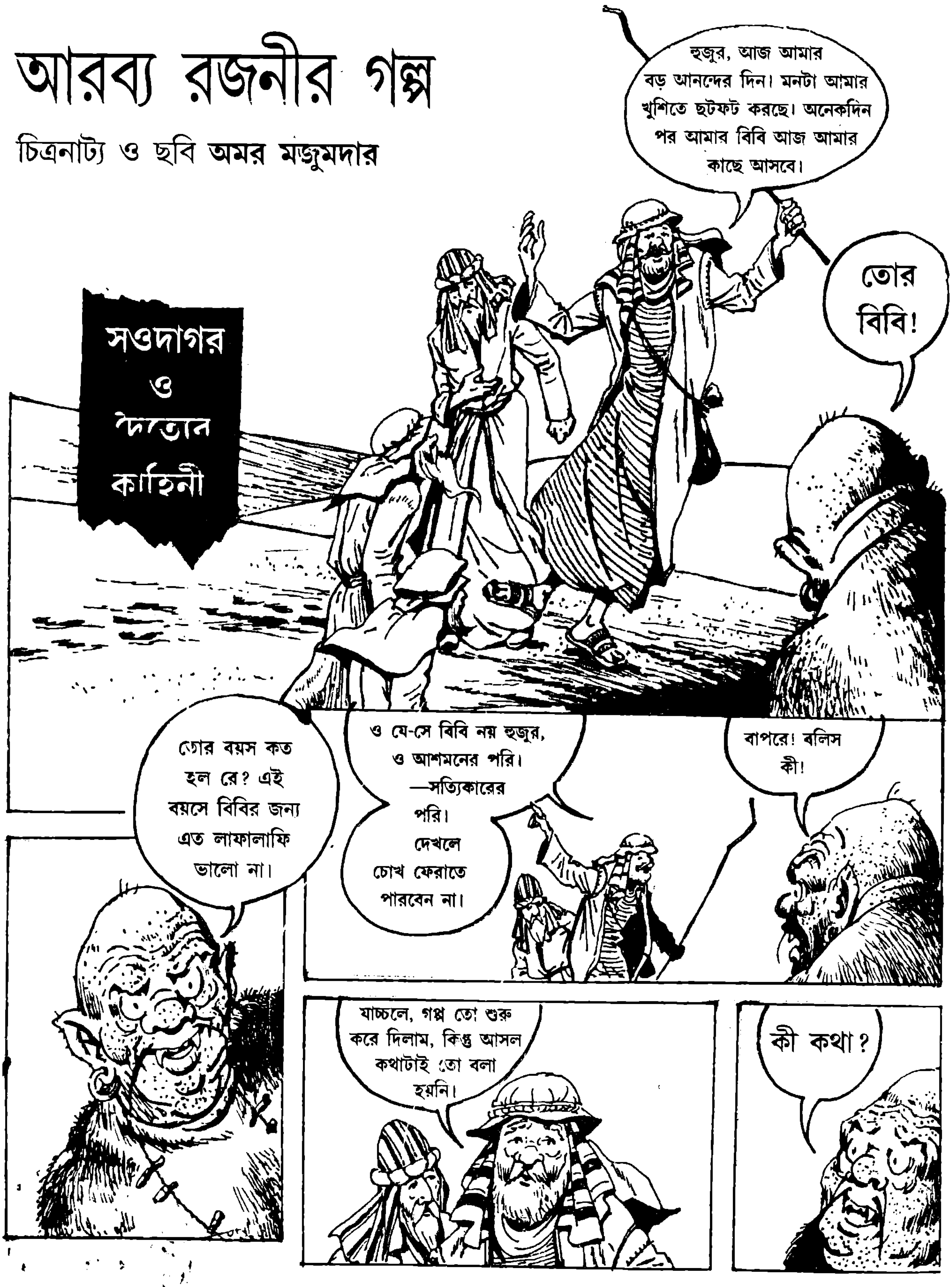

আমার একটা শর্ত আছে।
ওঃ। তোরা এগুলো যে কি বলিস!
সে সব হবেখন। নে, শুরু কর।
হুজুর, আমরা তিন ভাই। আমিই ছোট। বাবা মারা যেতে দুভাই ব্যবসা করতে বিদেশে চলে গেল।
আমি আমার দেশেই একটা ছোট্ট ব্যবসা খুলে বসলাম। ব্যাবসা মন্দ চলছিল না।
কিছুদিন পর দেখি, আমার দোকানের সামনে একটা ভিখিরি। জামা কাপড় ছেড়া, ফাটা, নোংরা।
ভাইজান, দুটো খেতে দে। দুদিন কিছু খাই নি।
একী! দাদা তুমি!!
বড় ভাইজানকে তাড়াতাড়ি ঘরে নিয়ে গিয়ে খেলে দিলাম, যত্ন করলাম। কিছুদিন পর আর একজন—!
এ নিশ্চয়ই তোর মেজ ভাইটা? —কেলো করেছে!
চলবে

গল্প

অ ভি জ্ঞা ন রা য় চৌ ধু রী

ডারউইনের ডায়েরি থেকে

বিশ্বজিৎদা সেদিন হঠাৎ ঝড় তুলল। ফুটবল-ক্রিকেট নয়, রাজনীতি নয়, [redacted] কথাও নয়। একেবারে চার্লস [redacted]। কথা হচ্ছিল সাগ্নিকের জাহাজে [redacted] বেড়াতে যাওয়া নিয়ে। সেখান [redacted] একেবারে চার্লস ডাবউইনের বিগলে [redacted] সমুদ্রযাত্রায়। হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন। [redacted] বিশ্বজিৎদার স্বভাব। কিছু একটা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলেই হল! কোনও-না-কোনওভাবে বিষয়টাকে তুলবেই।

বিশ্বজিৎদা বলতে শুরু করে,—ডারউইনের কেরিয়ারটা আমারই মতন। ছাত্রজীবন একেবারে সাদামাটা। বাবা-ই জোর করে কেমব্রিজে জিওলজি নিয়ে পড়াশোনা করতে পাঠিয়েছিলেন। কেমব্রিজ থেকে বাড়ি ফেরার পর উনি একটা চিঠি পান। ক্যাপ্টেন ফিৎজ্‌রয়ের কাছ থেকে। উনি বিশ্বভ্রমণে বেরোচ্ছেন। একজন প্রকৃতিবিদকে জায়গা দিতে পারেন। তবে সে-বাবদ উনি কোনওরকম টাকা দেবেন না। ডারউইনের হার্টের প্রবলেম ছিল। বাবারও আপত্তি ছিল। তা সত্ত্বেও ডারউইন ওই দীর্ঘসফরে বেরিয়ে যান...বল তো যাত্রা শুরুর সালটা কত ছিল?

আমাদের নিরুত্তর দেখে বিশ্বজিৎদা দ্বিগুণ উৎসাহে বলে ওঠে,—তোরা পড়ার বইয়ের বাইরে কোনও কিছুই তো জানলি না! শুনে রাখ, সালটা ছিল ১৮৩১।

আর দিনটা ছিল ২৭শে ডিসেম্বর। —খোলা দরজার সামনের চাতালে জুতো খুলতে-খুলতে অনিলিখা বলে ওঠে। অনিলিখাকে দেখেই বিশ্বজিৎদার সমস্ত উৎসাহ উবে গেল। উবে যাওয়ারই কথা। অনিলিখার সামনে আর জ্ঞান জাহির করা চলে না। এমন কোনও বিষয় নেই যা অনিলিখার অজানা। অতীতেও আমরা এর অনেক প্রমাণ পেয়েছি। অনিলিখার কথাই আমাদের কাছে বেদবাক্য। এমনকি বিশ্বজিৎদাও অনিলিখাকে আজকাল বেশ খাতির করে চলে।

তা অনিলিখা ফের বলে ওঠে,—ইংল্যান্ডের ড্যাভেনপোর্ট থেকে যাত্রা শুরু হয়। দু-দুবার যাত্রা শুরু করেও বাজে আবহাওয়া, ঝড় ইত্যাদির জন্য ফিরে আসতে হয়। কে তখন জানত, পৃথিবীর ইতিহাসে সবথেকে উল্লেখ্য-যাত্রা হতে চলেছে! এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল চিলি, পেরু ও প্রশান্ত মহাসাগরের আরও কয়েকটা দ্বীপের তটভূমি সার্ভে করা। ১৭ই ফেব্রুয়ারি বিগ্‌ল নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ-গোলার্ধে প্রবেশ করে। ১৮৩২ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি ওরা ব্রাজিলের বাহিয়া পৌঁছয়। ৩রা এপ্রিল, ১৮৩২ রিও-ডি-জেনেরোতে। ২০শে অক্টোবর, ১৮৩৫ সালে বিগ্‌ল গ্যালাপাগোস দ্বীপ থেকে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে ফিরতে শুরু করে। তাহিতি, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, মরিশাস, কেপ অফ গুডহোপ, সেন্ট হেলেনা, অ্যাসিকন দ্বীপ ছুঁয়ে ফলমাউথ পৌঁছয় ১৮৩৬ সালের ২রা অক্টোবর।

ডারউইন ফলমাউথে সেই ছোট জাহাজ ত্যাগ করেন। ১৮৩১ থেকে ১৮৩৬ প্রায় পাঁচ বছর ডারউইনের কেটেছিল ওই জাহাজে। ডারউইনের ছিল ডায়েরি লেখার নেশা। রীতিমতো সাহিত্যিকের চোখে সবকিছু দেখতেন। ওঁরা কবে কোথায় গিয়েছিলেন, কী করেছিলেন তার যাবতীয় বিবরণী পাওয়া যায় ডারউইনের ডায়েরিতে।

ডারউইনের এই ডায়েরি বই আকারে প্রকাশ হয়েছে। অনেকে পড়েছে। আমিও পড়েছি। কিন্তু একটা জিনিস আমার চোখে বেশ অদ্ভুত লেগেছে। যিনি প্রায় প্রতিদিন ডায়েরি লিখে গেছেন, তিনি হঠাৎ করে মাঝের পনেরো দিন লেখা ছেড়ে দিলেন কেন? আবার লেখা শুরু করলেন এমনভাবে যে তাতে কোনও বৈজ্ঞানিক বা অন্য তথ্যের ব্যাপার নেই, খালি দার্শনিকতা। ডায়েরির শেষের দিকের ডারউইন যেন আগের থেকে একেবারে আলাদা। এমন কী ঘটেছিল ওই পনেরো দিনে?

প্রশ্নটা হাওয়ায় ছুঁড়ে দিয়ে ইতিমধ্যেই অনিলিখা উঠে দাঁড়িয়েছে। যেতে-যেতে বলে ওঠে,—পরের শনিবার পুরো ব্যাপারটা বলা যাবে। আজ বিশাল কাজের লিস্ট নিয়ে বেরিয়েছি। পাঁচমিনিট টুঁ মেরে গেলাম।

অনিলিখার কাছ থেকে জোর করে গল্প আদায় করা শিবেরও অসাধ্য। অন্তত এক সপ্তাহের অপেক্ষা।

পরের শনিবার ঠিক দুটোর সময় অনিলিখা হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল। আমরা সবাই অনেক আগেই জড়ো হয়েছি। অনিলিখার হাতে বেশ কয়েকটা কাগজ। চেয়ারটা টেনে নিয়ে ও সোজাসুজি বলতে শুরু করে,—মাঝের পনেরো দিন লেখা হয়নি কথাটা ঠিক নয়। লেখা হয়েছিল। যাতে সবাই এই পনেরো দিনের কথা জানতে না-পারে, তাই ডারউইন অংশটা বাদ দিয়েছিলেন। আমি কী করে ওই পনেরো দিনের ডায়েরির খোঁজ পেলাম সে-সবের মধ্যে যাচ্ছি না। অরিজিনাল লেখাটা পড়ার ঠিক একঘণ্টা সময় পেয়েছিলাম। পরে সেটা অনুবাদ করে সংক্ষেপে লিখে রাখি। আজ সেটাই পড়ে শোনাচ্ছি।

অক্টোবর ১, সকাল দশটা

খানিক আগে আমরা টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগো ছেড়েছি। টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগো দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণতম প্রান্ত। ৫৩° দক্ষিণ অক্ষাংশে কিরকম ঠান্ডা হয় তা নিশ্চয়ই বলে বোঝাতে হবে না। জাহাজের মধ্যে একজায়গায় আগুন জ্বালিয়ে তাকে ঘিরে বসেছিলাম। জাহাজটা খুবই ছোট। জায়গার বড়ই অভাব। তবু তারমধ্যেই প্রায় তিনবছর কেটে গেল। এখন অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগো ভারি অদ্ভুত জায়গা। তটভূমির প্রায় গা দিয়েই সারমিয়েন্টো পাহাড়। উচ্চতা বেশি নয়। সাতহাজার ফুট। কিন্তু পুরো বরফে ঢাকা। মাঝে-মাঝেই ভীষণ শব্দ করে বরফের চাঁই জলে এসে পড়ছে। অজস্র হিমবাহ জলে ইতস্তত ভাসছে। এর আঘাতে কত জাহাজের যে সলিলসমাধি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ক্যাপ্টেন ফিৎজ তাই বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে আস্তে-আস্তে জাহাজ চালাচ্ছেন। হিমবাহগুলো ভয়ংকর হলে কী হবে! নীলচে হিমবাহর উপর সূর্যের আলো পড়ে যে অপূর্ব বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি করে, তার সৌন্দর্য বর্ণনা করা কঠিন। একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকলে চোখের খুব ক্ষতি হয়, অথচ চোখ সরাতেও ইচ্ছে হয় না। আপাতত আমরা উত্তরের দিকে চলেছি। ভাল্ পারেসোর দিকে।

যেতে-যেতে পুমার কথা মনে হচ্ছে। পুমা আসলে একধরনের সিংহ। মূলত দক্ষিণ আমেরিকাতেই পুমা দেখা যায়। অবশ্য পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই এর অস্তিত্ব আছে। কিন্তু প্রত্যেক জায়গাতেই এদের আচার-ব্যবহার আলাদা। খানিকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এদের চেহারাতেও। নিরক্ষরেখার উষ্ণ বনাঞ্চলেও যেমন এদের পাওয়া যায়, তেমনই আবার এদের দেখতে পাওয়া যায় টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগোর মতো ঠান্ডা জায়গাতেও। সমতলেও যেমন দেখেছি, তেমনি এদের পায়ের ছাপ দেখেছি চিলির কর্ডিয়েলাতে দশহাজার ফুট উঁচুতে। ল্যা-প্লাভায় পুমার শিকার হয় হরিণ, অস্ট্রিচের মতো প্রাণীরা। মানুষের উপরে এরা কখনও আক্রমণ করে না। কিন্তু চিলিতে যেহেতু হরিণ অত সহজলভ্য নয়, তাই মানুষের উপর আক্রমণের ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়।

এবার হামিংবার্ড-এর কথায় আসা যাক। লিজার মতো গরম জায়গাতেও যেমন পাওয়া যায়, তেমনই পাওয়া যায় টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগোর বনে। তবে প্রয়োজন মতো এদের চেহারা পরিবর্তন হয়েছে তাই ঠান্ডা জায়গায় যে হামিংবার্ড দেখেছি তারা অনেক বড়সড় পুরু পালকে মোড়া।

লেখায় বাধা আসছে। খানিকক্ষণ ধরে উপরে একটা গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। দেখে আসি কী ব্যাপার! আজকে লেখা এইটুকুই থাক!

অক্টোবর ২, রাত একটা

ভারি অদ্ভুত এই দ্বীপ, দ্বীপটা না দেখলে আমাদের পুরো যাত্রা বিফলই হতো মনে হয়। তা-কী করে এই দ্বীপে এসে পৌঁছলাম? না, তাহলে একটু আগে থেকেই বলতে হয়।

সেদিন ডেকে চিৎকার-চেঁচামেচি হচ্ছে দেখে উপরে উঠে আসি। একটা অদ্ভুত প্রাণী জালে ধরা পড়েছে। দেখতে অনেকটা ডলফিনের মতো। কিন্তু ডলফিনের মতো দাঁত নেই। রঙ উজ্জ্বল লাল। আর ডানার পাশ দিয়ে হাতের মতো কিছু একটা বেরিয়ে আছে। ডাঙায় হাঁটার সময় সেটায় ভর করে হাঁটে। এরকম কোনও জীবের অস্তিত্বের কথা আমার জানা ছিল না। সবথেকে অবাক ব্যাপার—আমরা যে ওকে ধরেছি, ওর কোনও ক্ষতি করতে পারি, এরকম কোনও বোধই ওর মধ্যে নেই। দিব্যি আনন্দে আমাদের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে লাগল।

খানিকবাদে হঠাৎ দেখি ক্যাপ্টেন আমাকে ডাকছে। দূরবিন হাতে খানিকটা দূরে জলের দিকে কী দেখাচ্ছে। দূরবিন চোখে দিলাম। আমাদের ধরা ওই প্রাণীটার মতোই একঝাঁক প্রাণী সাঁতরে যাচ্ছে উত্তর-পশ্চিম দিকে। আমরা ওই ঝাঁকটার পিছু নিলাম। দেখা যাক ওরা কোথায় যায়। আমাদের ধরা প্রাণীটাকেও খানিকবাদে জলের মধ্যে ছেড়ে দিলাম। ও গিয়ে ঝাঁকের মধ্যে মিশল।

মিনিট কুড়ি বাদে দেখলাম, আমরা একটা সবুজ তটভূমির দেখে এগোচ্ছি। ম্যাপে এই দ্বীপের কোনও চিহ্ন নেই।

আমরা দ্বীপের দিকেই এগোলাম। দ্বীপটা পাহাড় দিয়ে ঘেরা। সমুদ্র থেকে সোজা উপর দিকে উঠে গেছে। সমুদ্রের নিচে থেকে হঠাৎ করে আগ্নেয়গিরি জেগে উঠে শুনেছি এরকম ভূখণ্ডের সৃষ্টি করে। হয়তো বেশিদিন হল এই দ্বীপ সৃষ্টি হয়নি। তাই এর অস্তিত্বের কথা সবার অজানা।

দ্বীপের ধার দিয়ে বেশ খানিকটা ঘোরার পর খানিকটা সমতল তটভূমির সন্ধান পাওয়া গেল। এখান দিয়ে হেঁটে দ্বীপের মধ্যে ঢোকা যাবে। জাহাজ নোঙর করে আমরা ভেতরের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে হাঁটার সময় লক্ষ্য করলাম এখানকার গাছগুলো ভিন্ন প্রজাতির। আর সব গাছেই কিরকম একটা অদ্ভুত বুনো গন্ধ। খুব তীব্র পারফিউমের মতো। পথে কয়েকটা জলাশয় পড়ল। বিশ্রাম নেবার জন্য একটা জলাশয়ের ধারে গিয়ে বসলাম।

বেশ খানিকক্ষণ হয়ে গেল, দ্বীপটার মধ্যে কিন্তু একটাও জীবজন্তুর দেখা পেলাম না। প্রাণহীন দ্বীপ নাকি? ভাবতে-ভাবতেই হঠাৎ দেখি ঝোপের ভেতর থেকে একটা হরিণশ্রেণীর প্রাণী বেরিয়ে জলাশয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হরিণশ্রেণী বলছি, কারণ হরিণের মতো রঙ নয়, গাঢ় নীল। আমি প্রাণীটার দিকে এগিয়ে গেলাম। আরও কাছ থেকে দেখব বলে। কিন্তু আমাকে দেখে ও বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করল না। উল্টে ও যেন আমার মতোই একইরকম কৌতূহলে আমাকে মুখ তুলে দেখতে লাগল। ওর এই অদ্ভুত রঙের জন্য খুব সহজেই অন্য প্রাণীর শিকার হয়ে উঠতে পারে।

সব জায়গাতেই কিছু লোক থাকে যারা বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে কোনও কাজ করে না। ক্রিস পেচি ওরকমই একজন। হঠাৎ করে কোথা থেকে ক্রিস পেচি ছুটে এসে প্রাণীটাকে গাছের ডাল নিয়ে তাড়া করল। অবশ্য তাড়া করায় আমার ভালোই হল। দেখলাম এই প্রাণীটার হরিণের সঙ্গে আরেকটা তফাত আছে। তা হল এই প্রাণীটা হরিণের দশভাগের একভাগ বেগেও ছুটতে পারে না।

সেদিন আমরা ঠিক করলাম জাহাজে না-ফিরে তাঁবু খাটিয়ে দ্বীপেই রাত কাটাব। তেমন হিংস্র কোনও জানোয়ার এ-দ্বীপে আছে বলে মনে হয় না। আর থাকলেও আত্মরক্ষার জন্য অনেক অস্ত্র আমাদের কাছে আছে।

রাতে খাবার পর আগুন জ্বালিয়ে তাঁবুর বাইরে এসে বসলাম। কী অপূর্ব এই দ্বীপ! পাহাড়-হ্রদ-সমুদ্র সবুজে-ঢাকা উপত্যকা—কী নেই এ-দ্বীপে! কেউ যেন পৃথিবীর সব সৌন্দর্য একজায়গায় এনে জড়ো করেছে। কিন্তু এত সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও কোনও কিছু একটার যেন অভাব আছে। আর তাই বোধহয় সামনের পাইনের বনে ঝাঁপিয়ে পড়া চাঁদের আলো দেখেও মন খারাপ লাগছিল।

তিনবছর হল বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছি,

বাবা-দাদা কে কেমন আছেন কিছুই খবর পাইনি। কী লাভ হয়েছে এই তিনবছর জাহাজে করে দেশ-বিদেশ ঘুরে! নানান ধরনের জীবজন্তু, গাছপালা আর জীবাশ্মের সন্ধানে জীবনের তিনটে মূল্যবান বছর হারিয়ে বসে আছি। জীবজগতের এই সৃষ্টির রহস্য ভেদ করার ক্ষমতা আর যারই থাকুক না-কেন, এটুকু বুঝেছি আমার নেই।

আমার পাশে বসে আছে কেন্ ডারিংটন। মাঝারি চেহারা। জাহাজের কলকব্জা খুব ভালো বোঝে। মেনটেনান্সের জন্য ওকে নিয়ে আসা হয়েছে। সারাক্ষণ হইচই করতে ভালোবাসে। তা সে-ও দেখছি মনমরা হয়ে বসে আছে। দু-একটা কথা বলার চেষ্টা করলাম। হুঁ-হাঁ বলে কাটিয়ে গেল। বুঝলাম ওর মনের অবস্থা ভালো নেই।

এরমধ্যে খানিকক্ষণ ধরে একটা খস-খস আওয়াজ শুরু হয়েছে। মাঝে-মাঝে পাচ্ছি, মাঝে-মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ কেন্-ই আবিষ্কার করল—শজারু। আমার ঠিক দুফুট দূরে নির্ভয়ে বসে আছে। ভয় অবশ্য আমারই পাওয়ার কথা! কাঁটা ফুটলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু সতর্ক হবার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল। আমার অবশ্য নয়—কেন্-এর। কেন্ কী একটা ফল খাচ্ছিল। তারই আকর্ষণে কিনা জানি না হঠাৎ করে কেন্-এর গা ঘেঁষে শজারুটা গিয়ে বসল। কেন্ও চমকে উঠেছিল। কিন্তু এবার আমার চমকে ওঠার পালা। কেন্ শজারুটাকে কোলে তুলে দিব্যি আদর করছে। খানিকবাদে নিস্তব্ধতা ভেঙে ও বলে উঠল,—ডারউইন, হাত দিতে পার। এটা শজারু নয়। এর কাঁটাগুলো একেবারে নরম। হাত দিলে বেশ আরাম হয়।

একটু দ্বিধা নিয়ে কেন্-এর কথামতো শজারুটার গায়ে হাত দিলাম। আশ্চর্য, কাঁটাগুলো শজারুর মতো শক্তও নয়, বিঁধেও যায় না। খুব নরম লম্বা-লম্বা রোমের উপর হাত দিলে যেমন লাগে সে-রকম। আর এ-প্রাণীটাও সত্যি অদ্ভুত। এরও কোনও ভয়ডর নেই। দিব্যি নিশ্চিন্তে আমাদের মাঝখানে বসে রইল। যেন আমাদের পোষমানা, আমাদের সান্নিধ্য উপভোগ করছে।

রাত বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঠান্ডাটাও বাড়ছে। তাঁবুর ভেতরে ঢুকে তাই মোমবাতির আলোয় ডায়েরি লিখতে বসেছি। খানিক্ষণ ধরে মনের মধ্যে যে-ভাবনাটা শুরু হয়েছে সেটা আর আজকে লিখলাম না। কালকে দেখা যাবে সেটা নেহাতই অমূলক কিনা!

অক্টোবর ৪, সন্ধে আটটা

দুদিনের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেল। জানি না আমিও এই দ্বীপ ছেড়ে বেরতে পারব কিনা! নাকি আমার অবস্থাও কেন্, রোজ, ডেভ, জনের মতো হতে চলেছে। আর তাই এই ডায়েরি-লেখাটা আরও বেশি প্রয়োজন। যাতে লোকে এরকম একটা ব্যতিক্রমী জায়গার অস্তিত্বের কথা জানতে পারে।

শুরু করা যাক কাল সকাল থেকে। পরশু রাতে কেন্-এর নাক-ডাকা ছাড়া আর কোনও ঘটনা ঘটেনি। শজারু শ্রেণীর প্রাণীটাও আমাদের তাঁবুর মধ্যে এসে শুয়েছিল। সকালে ঘুম ভেঙে দেখি কোথায় চলে গেছে।

আরেকটু পরে আমরা দ্বীপের মধ্যে ঘুরতে বেরলাম। দ্বীপের আরও ভেতরের দিকে। গাছ থেকে যে-গন্ধটা পাচ্ছিলাম, সেটা যেন আরও তীব্র হচ্ছে। এখানকার আবহাওয়া ট্রপিকাল না-হলেও যে-জঙ্গলটায় ঢুকলাম তার সঙ্গে ট্রপিকাল ফরেস্টের অনেক মিল। আকাশ ছোঁয়া লম্বা-লম্বা গাছ সূর্যের মুখ দেখতে দেয় না। তবে এ-ধরনের বনে জীবজন্তু, পশুপাখি অজস্র থাকে। এখানে কিন্তু সে-রকম কিছু চোখে পড়ল না। একটা গাছের উপর খালি একটা শকুন বসে থাকতে দেখলাম। খানিকবাদে একটা সাপ চোখে পড়ল। নেতিয়ে মাটিতে পড়ে আছে। কিং কোবরা। সাপের রাজাকে এ-রকম নিস্পৃহভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায় না। লাঠি দিয়ে খোঁচা দিতেও ফণা না-তুলে আস্তে-আস্তে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। অসুস্থ হবে হয়তো।

ওদিকে ডেভ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল,—লাল ইঁদুর!

ওর অঙ্গুলিনির্দিষ্ট দিকে তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই তাই। সাপটার থেকে হাতদুয়েক দূরে টকটকে লাল রঙের ইঁদুর। শিকার ও শিকারির এভাবে পাশাপাশি বসে থাকা কল্পনা করা যায় না। যেন দুজনেই আরও কোনও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। ইঁদুরের রঙ মেটে হলে চট করে লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে লাল বলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

আমার মাথার মধ্যে সব চিন্তাধারা কিরকম জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। তাহলে কি আমার এতদিনের পরিশ্রম, চিন্তাভাবনা সবই মিথ্যে? বিভিন্ন দেশের অজস্র জীবজন্তু উদ্ভিদশ্রেণী দেখে আমি সিদ্ধান্তে আসতে চলেছিলাম যে প্রত্যেক জীব তার জীবনধারণের জন্য পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। সেই পরিবর্তন ঠিক দিকে হলে সেই জীব এই জীবজগতে টিকে যায়। না- হলে বিলুপ্ত হয়ে যায়। একেক দেশের পুমার চেহারা তাই এক-একরকম! হামিংবার্ড এক-একরকম। কিন্তু এখানে যেন সবকিছুই অন্যরকম। কারও কোনও আত্মরক্ষার অস্ত্রই নেই। তবু তারা কীভাবে যে জীবনসংগ্রামে টিকে আছে এটাই আশ্চর্য!

এসব ভাবতে-ভাবতে হাঁটতে থাকলাম। খানিকবাদে উপত্যকার মতো একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। জায়গাটা থেকে চারদিকে বেশ কয়েকটা পাহাড় উঠে গেছে। একটা কম-খাড়া পাহাড়ের গা-বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম।

বেশ খানিকটা ওঠার পর জঙ্গল কিছুটা কমে গেল। আমরা ওই পাহাড়ের প্রায় উপরে উঠে গেছি। দ্বীপের বেশ খানিকটা জায়গা এখান থেকে দেখা যায়। সবুজ বনভূমির মধ্যে ছড়িয়ে থাকা লেকগুলো উপর থেকে দারুণ লাগছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছি। এরই মধ্যে হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ পেলাম। একবার নয়, তিন-তিনবার। ঘাবড়ে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি জনের বন্দুক থেকে তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আর ওর থেকে মোটামুটি কুড়ি হাত দূরে একটা চিতাবাঘ মরে পড়ে আছে। চিতাবাঘটা নাকি পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে আস্তে-আস্তে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছিল। এগিয়ে গিয়ে চিতাবাঘটাকে কাছ থেকে দেখলাম। অদ্ভুত। এর পায়ের পেশী দেখে মনে হয় না, গাছ বেয়ে উঠতে পারে। আমার এ-বিষয়ে অনেক পড়াশোনা আছে। দেখে মনে হল না এ খুব জোরে ছুটতে পারে। শরীরের গঠন সে-রকমভাবে গড়ে ওঠেনি।

চিতাবাঘটা যেদিক দিয়ে এসেছিল, আমরা ঝোপ সরিয়ে-সরিয়ে সেদিকে এগোতে লাগলাম। খানিকটা এগোবার পরে আরেকটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। চারদিকে বেশকিছু চতুষ্পদ প্রাণীর কঙ্কাল পড়ে আছে। একটু দেখতেই বুঝলাম, এগুলো অন্য কোনও প্রাণীর নয়, চিতাবাঘের। তবে একটা নয়। বেশ কিছু চিতাবাঘের। কী ব্যাপার! এখানে কি কোনও দাবানল লেগেছিল! চারদিকের গাছ-মাটি দেখে তো অন্তত তা মনে হয় না। তাহলে কি আরও কোনও শক্তিশালী প্রাণীর শিকার হয়েছে এরা? কে জানে?

বেলা অনেক হয়ে গেছে। সবার খিদেও পেয়েছে খুব। তাই তাঁবুর উদ্দেশ্যে ফিরতে শুরু করলাম।

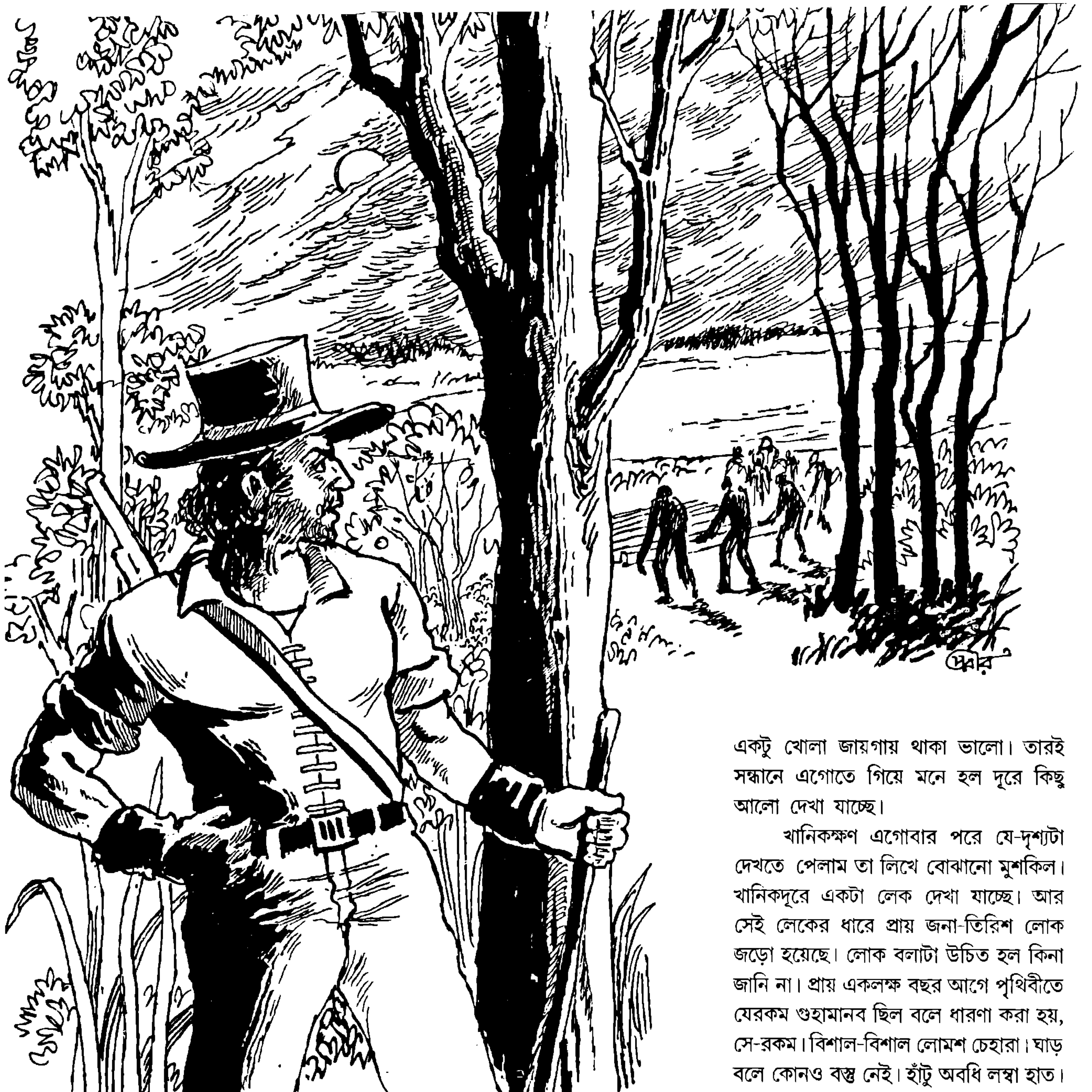

দুপুরে খাওয়াটা বেশ জব্বর হল। টার্কির রোস্ট হয়েছিল। খাওয়ার পরে বিশ্রাম না-নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। একটু অন্যদিকে। সবাই খুব হতোদ্যম। বেরনোর আর উৎসাহ নেই, তাই একাই বেরোতে হল।

বনের মধ্যে দিয়ে ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর একটা হথহর্ন গাছের তলায় বিশ্রাম নিতে বসলাম। গাছের সেই বিদঘুটে গন্ধটা মনকে কেমন অবসন্ন করে দিচ্ছে। বেঁচে থাকা বা না-থাকা, কাজ করা বা না-করা সবকিছুতেই কেমন যেন নির্লিপ্তি গড়ে উঠছে। জীবনকে সেই মুহূর্তে এতটাই অর্থহীন মনে হল। সে-গাছের তলাতে বসেই রইলাম।

বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন সন্ধে হয়ে গেছে। অন্য সময় হলে হয়তো ভয় পেয়ে যেতাম। একা এই ঘন-বনে রাত কাটানো। কিন্তু তখন সেই ভয়ও নেই। রওনা হলাম তাঁবুর উদ্দেশ্যে। কিন্তু চাঁদের আলোতে এই বনবনানীর মধ্যে দিয়ে ঠিক পথ খুঁজে পেলাম না। ঘণ্টাখানেক এদিক-ওদিক ঘোরার পরে বুঝলাম পথ হারিয়েছি। সকাল হবার আগে ফেরার চেষ্টা করা বৃথা।

ঘন জঙ্গলের মধ্যে রাত না-কাটিয়ে একটু খোলা জায়গায় থাকা ভালো। তারই সন্ধানে এগোতে গিয়ে মনে হল দূরে কিছু আলো দেখা যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ এগোবার পরে যে-দৃশ্যটা দেখতে পেলাম তা লিখে বোঝানো মুশকিল। খানিকদূরে একটা লেক দেখা যাচ্ছে। আর সেই লেকের ধারে প্রায় জনা-তিরিশ লোক জড়ো হয়েছে। লোক বলাটা উচিত হল কিনা জানি না। প্রায় একলক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে যেরকম গুহামানব ছিল বলে ধারণা করা হয়, সে-রকম। বিশাল-বিশাল লোমশ চেহারা। ঘাড় বলে কোনও বস্তু নেই। হাঁটু অবধি লম্বা হাত।

ওদের মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতা জাতীয় কিছু হচ্ছে বলে মনে হল। বেশ কয়েকটা একইধরনের ছোট-ছোট কাঠ পাশাপাশি মাটিতে রাখা আছে। এক-এক করে জনাদশেক লোক এসে যে-যার মতো কাঠ নির্বাচন করল। এবার উলটে কাঠের অন্যদিক দেখতে লাগল। একজনকে হঠাৎ খুব আনন্দিত ও উত্তেজিত মনে হল। বোধহয় সেই ঠিক কাঠ নির্বাচন করে জিতেছে। একজন প্রধান-জাতীয় লোক এসে সেই লোকটার গলায় কাঠের টুকরো দিয়ে বোনা একটা মালা পরিয়ে দিল।

লেকের ধারে একজায়গায় বেশ কিছু কাঠ জড়ো করে চিতার মতো করা ছিল। লোকটা গিয়ে শুয়ে পড়ল তার ওপর। কয়েকটা

লোক লতাপাতা দিয়ে লোকটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে কাঠের সঙ্গে বাঁধল। আরও কিছু কাঠ-চাপানো হল। কী হতে চলেছে বুঝতে পারছি না। এবার একটা মেয়ে এসে ওই কাঠের উপর কী একটা তরল ছড়িয়ে চকমকি ঘষে আগুন লাগানোর চেষ্টা শুরু করল।

কী হতে চলেছে? পুরস্কার হিসেবে জীবন্ত আগুনে পোড়ানো হচ্ছে? এখানে কি তবে মৃত্যুটাই সবথেকে আকাঙ্খিত পুরস্কার?

এসব ভাবছি, ইতিমধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। মেয়ে-পুরুষ সবাই মিলে সুর করে মন্ত্রজাতীয় কিছু একটা বলতে লাগল। তার মানে এরা একেবারে অনুন্নত নয়। এদের ভাষা আছে। হয়তো লিখতেও পারে। কারণ কাঠের উলটোদিকে কোনও একটা লেখা বা সংকেত-জাতীয় কিছু একটা দেখেছিল নিশ্চয়ই।

মন্ত্র পড়া হয়ে গেলে ওরা সবাই গোল হয়ে আগুন ঘিরে বসল। কারওর মুখে কোনও কথা নেই। হাসি নেই। এ-এক অদ্ভুত সভা। আমিও যে কতক্ষণ বসেছিলাম কে জানে!

সকাল হতে ওই লোকগুলো উলটো-দিকের বনে ঢুকে গেল। আমাকেও আশা করি ওরা দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু সে-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করল না। মনে হল ওদের পিছু নিই। ওদের সম্বন্ধে আরও জানা দরকার। কিন্তু আশ্চর্য, উৎসাহ পেলাম না। মনে হল এখানেই বসে থাকি। আরও ঘণ্টাখানেক পরে জোর করে উঠে দাঁড়ালাম। খিদে পেয়েছে, ফিরতেই হবে।

ফিরতে-ফিরতে আরও একঘণ্টা হয়ে গেল। পরপর অনেকগুলো তাঁবু, আমাকে আসতে দেখেই ক্যাপ্টেন ফিৎজ্রয় একটা তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল,—কাল রাতে কোথায় ছিলে? আমি প্রচণ্ড চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম তোমার অবস্থাও কেন্, ডেভের মতো হল কিনা!

একটু থেমে ফিৎজ্রয় ফের বলে উঠল, —না, না এ-দ্বীপে আর নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়ব। সবাই কিরকম নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

—কেন্, ডেভের কী হয়েছে?

—শুধু কেন্, ডেভ! কালকে সন্ধে থেকে তোমাকে নিয়ে সবসুদ্ধ আটজন নিখোঁজ। রাত আটটা নাগাদ তোমরা কেউ ফিরলে না-দেখে আমরা মশাল নিয়ে বেরোলাম। কালকে দুপুরে যেদিকে গিয়েছিলাম, সেদিকেই তোমাদের যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে ওদিকে এগোলাম। কালকে আমরা যদ্দুর গিয়েছিলাম তার থেকে আরও ঘণ্টাখানেক এগিয়ে গেলাম। এখানকার পাহাড়টা বেশ ন্যাড়া, গাছ বেশ কমে এসেছে, তাই দূর থেকে হঠাৎ কেন্ আর ডেভকে দেখতে পেলাম। ওরা দুজনেই বিপজ্জনকভাবে পাহাড়ের প্রান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ছুটে গিয়ে কেন্‌কে ধরে ফেললেও, ডেভকে ধরতে পারিনি। তার আগেই নিচে ঝাঁপ দিয়েছে। ওর কোনও চিহ্নই নেই। খাড়া পাহাড়টার নিচের দিকে জঙ্গল। তারমধ্যে উপর থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই। কেন্-এর তখনও ঘোর কাটেনি। বারবার বলে চলেছে, আমি মরতে চাই, আমি মরতে চাই। কালকের পর থেকে এখনও অবধি ওর ওই অবস্থা চলছে। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

—আর ডেভ?

—আমরা পাহাড়ের থেকে নেমে ওই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। ডেভের মৃতদেহ পেলাম না, তবে যা দেখলাম তা বিস্ময়কর। চারদিকে হাজার-হাজার কঙ্কাল ছড়িয়ে আছে। দেখেই বোঝা যায় এরাও প্রত্যেকে পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়েছে। কতধরনের প্রাণীর কঙ্কাল যে ছড়িয়ে আছে, তা বলে বোঝানো যাবে না। কিছু-কিছু কঙ্কাল তো আমার পরিচিত সব প্রাণীর থেকে অনেক বড় চেহারার প্রাণীর বলে মনে হল। মনে হল ওই জায়গাটা সবাই সুইসাইড-স্পট হিসেবে ব্যবহার করে। ওখান থেকে আমরা সোজা ফিরে এলাম। রাত অনেক হয়ে গেছিল। সবাই ক্লান্ত, অবসন্ন, মন খারাপ। বাকিদের খোঁজ এখনও পাইনি। ...তা তোমার কী খবর?

আমিও আমার রাতের অভিজ্ঞতা ফিৎজ্‌রয়কে খুলে বললাম।

—আমার মনে হয় এ-দ্বীপের পরিবেশে এমন কিছু আছে, যার জন্য এই দ্বীপের জীবজন্তুদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা খুব বেশি। হয়তো তারা বেঁচে থাকার আগ্রহই হারিয়ে ফেলে। আরেকটা জিনিসও লক্ষ্য করার মতন। এ-দ্বীপের গাছ, পশুপাখি পৃথিবীর বাকি যে-কোনও জায়গার থেকে একদম অন্যরকম। আমার মনে হয় এ-দ্বীপে বেশ কিছুদিন থেকে এখানকার জীবজন্তুদের স্টাডি করা দরকার।

আমার কথা থামিয়ে ক্যাপ্টেন অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠল,—ডারউইন, তোমার মতো শুধু গবেষণা করতে আমি আসিনি। আমার দায়িত্ব হচ্ছে আমার সহযাত্রীদের সাবধানে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। [illegible] তাই আমার ইচ্ছে কালকেই এ-দ্বীপ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব। কাল সকালেই। সবাইকে [illegible] এই দ্বীপে হারাতে চাই না।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলার পরে অন্য বাকি পাঁচজনের খোঁজে বেরলাম। দ্বীপের বেশ কিছু জায়গা একেবারে দুর্গম। দিনের শেষে আমরা যখন ফিরে এলাম তখন ওই পাঁচজনের খোঁজ তো পাওয়া যায়ইনি, উলটে আরেকজন খালাসিকেও শুনলাম সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে-ও নিখোঁজ।

সত্যিই এ অভিশপ্ত দ্বীপে আর থাকা উচিত হবে না। অন্তত সব সহযাত্রীদের ঝিমিয়ে-পড়া অবস্থা দেখে তাই মনে হচ্ছে।

অক্টোবর ৬, সকাল দশটা

আর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই আমরা ভাল্‌পারেসোতে পৌঁছে যাব। অদ্ভুত ব্যাপার। দ্বীপ ছাড়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবার সবার মধ্যে সেই নির্জীব ভাবটা কেটে গেছে। আমারও। মনে হচ্ছে জীবনটা কত মূল্যবান। তবে ওই দ্বীপের কথা এখনও মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। গত কয়েকদিনের কথা সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যাবে কিনা জানি না। দেশে ফিরে ওই দ্বীপের কথা বললে, জানাজানি হয়ে গেলে অনেকেই সে-কথার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে।

জীবজগতের মধ্যে পরিবেশের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর জন্য যুগ-যুগ ধরে পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন জীবের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আবশ্যক। পরিবেশের সঙ্গে সেভাবে খাপ খাওয়াতে না পারলে সেই জীব হারিয়ে যায়, বিলুপ্ত হয়। খালি শক্তিমানেরাই টিকে যায়। কিন্তু এই দ্বীপ সবদিক দিয়েই ব্যতিক্রম। তার কারণ এ-দ্বীপের প্রত্যেকটা জীব-মৃত্যুর জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে। অভিশপ্ত জীবন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাক এই কামনা করে। তাই কোনও জীবনসংগ্রাম নেই, কোনও প্রতিযোগিতা নেই, লড়ে বেঁচে থাকার তাগিদ নেই। এ-ধরনের পরিবেশে কি দরকার অভিযোজনের? কি দরকার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর? এখানে তাই শক্তিমানেরা হারিয়ে যায়। তারা আত্মঘাতী হয়। পড়ে থাকে তারাই যারা দুর্বল, যারা নিরীহ। যেমন আমার হাতে ধরা এই শজারুটা, আমাদের সেই প্রথম দিনের বন্ধু।

ছবি ঃ প্রবীরকুমার সামন্ত

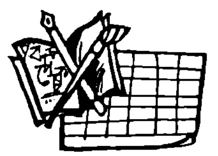

অবি সরকার

রুটিন

পড়ার টেবিলের সামনের দেওয়ালে টাঙানো রুটিন-চার্টটা চোখে পড়লেই পাপাইয়ের মাথা গরম হয়ে যায় আজকাল। দুখানা ফুলস্কেপ কাগজ জুড়ে, সোম থেকে রবি, সকাল থেকে রাত্রি—এতটা থেকে অতটা, কখন কোন বিষয়—সব চার্ট করা আছে।

যেমন, সোম ঃ ভোর ছটায় ওঠা, আটটা পর্যন্ত পড়া, আটটা থেকে সাড়ে আটটা খাওয়া, সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে নটা প্রাইভেট টিউটর এসে পড়াবেন, সাড়ে নটা থেকে দশটা স্নান-খাওয়া, দশটা-দশে স্কুলবাসের জন্য রাস্তার মোড়ে। সাড়ে চারটেতে স্কুল ছুটি। পাঁচটা দশে স্কুলের বাস নামিয়ে দেবে, বাড়ি পাঁচ মিনিটে, অর্থাৎ সোয়া-পাঁচটায় বাড়ি। মুখ-হাত ধুয়ে খাবার টেবিলে বসা সাড়ে পাঁচটা। আধঘণ্টা ছুটি। ঠিক ছটায় সেতার প্রাক্টিস, সাড়ে ছটায় ছবি আঁকা, সাতটায় প্রাইভেট টিউটর আসবেন, নটায় যাবেন। সাড়ে নটা পর্যন্ত পড়ার টেবিলে থাকতে হবে। দশ মিনিট বিশ্রাম। তারপর রাতের খাওয়া। সাড়ে দশটায় শুতে যাওয়া।

রবিবারের চার্টে সংযোজন ঃ সাড়ে সাতটায় ছবি আঁকার স্কুল। দশটায় ফেরা। বারোটার মধ্যে স্নান-খাওয়া সেরে বিশ্রাম। বিকেল তিনটেয় সেতার ক্লাসে যাওয়া, পাঁচটায় ফেরা। সাড়ে পাঁচটায় মাস্টারমশাই পড়াতে আসবেন, আটটায় ছুটি।

এর পরের অধ্যায়ে সোমবারের ক্লাসের সব বিষয়ের পড়া দেখে রাখা—খাতা গোছানো, তারপর কয়েকটা ড্যাশ-ড্যাশ-ড্যাশ অর্থাৎ এমার্জেন্সি বিষয়। যেমন, কোনও অংকন-আবৃত্তি বা ক্যুইজ কম্পিটিশন থাকলে সেই বিষয়ের প্র্যাকটিস বা পড়াশুনো।

বেশ কিছুদিন ধরে পাপাইয়ের মাথা গরম হচ্ছিল, আজ হঠাৎ যেন খেপে গেল। স্কুল থেকে ফেরার পরই ও রোজকার সুরে-সুর মেলাতে পারল না। সব খেয়াল-খুশিমতো করে যেতে লাগল। ছবি আঁকল না, সেতার বাজাল না, মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে বসে অমনোযোগী হয়ে রইল। যাবার আগে মার কাছে সে-বিষয়ে নালিশ জানিয়ে গেলেন মাস্টারমশাই।

মা বকাবকি করলেন—বাবা গম্ভীর হয়ে রইলেন। খাবার টেবিলে কেউ কথা বলল না। পাপাই চুপচাপ খেয়ে উঠে গেল। ওর নিজের ঘর আছে। সোজা দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

অনেক রাতে সেতারের শব্দে বাবার ঘুম ভেঙে গেল। পাপাইয়ের ঘরে সেতার বাজছে। পাগলের মতো প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে পাপাই। মা-ও উঠে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। বাবা পাপাইয়ের ঘরের সামনে এসে আস্তে ডাকলেন,—পাপাই!

সেতার বেজেই চলেছে। আবার ডাকলেন, সেতারের ঝংকারে সে-ডাক চাপা পড়ে গেল। বাবা এবার দরজায় টোকা দিয়ে জোরে বললেন,—শুয়ে পড়ো পাপাই, রাত জাগতে নেই।

সেতার তখন ঝালায় বাজছে। হতাশ হয়ে মা-বাবা দুজনেই ফিরে গেলেন নিজের ঘরে। যেতে-যেতে মা বললেন,—দিন-দিন বেশ বেয়াড়া হয়ে উঠছে পাপাই, একটু কড়া হাতে শাসন করা দরকার—

পরদিন সকাল থেকে পাপাই আবার রুটিন মাফিক করল সবকিছু। কিন্তু কারোর সাথে কথা বলল না। বাবা দুবার জিগ্যেস করেছিলেন,—রাত জেগে সেতার বাজাবার কী দরকার ছিল?

পাপাই জবাব দেয়নি। শুধু ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখেছে একবার। যেন সময়কে নিয়েই ওর সবকিছু। অন্য কারো কথার জবাব দেওয়াটা রুটিন বহির্ভূত।

অনেকদিন পর গিরিডি থেকে এলেন সেজমামা-মামি আর দুই মামাতো ভাই-বোন, বোম্বেটে আর ডুম। বোম্বেটে ওরই বয়সি, ডুম দুবছরের ছোট। ওদের সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল তিনবছর আগে গিরিডি বেড়াতে গিয়ে। মামা ওখানকার নামকরা ডাক্তার। এতদিনে ওঁরা কলকাতা এলেন।

মা তো খুশিতে ডগোমগো। বাবা ফোন করে ছুটি নিলেন।

পাপাই এসে মামা-মামিকে প্রণাম করল। ভাই- বোনদের দিকে চেয়ে শুধু বলল,—হ্যালো, ভালো আছ? করমর্দন করল। তারপর ওদের উচ্ছ্বাসে জল ঢেলে দিয়ে নিজের পড়ার ঘরে ঢুকে গেল।

মামা-মামি বোম্বেটে-ডুম সবাই অবাক হয়ে ওর বাবা-মার দিকে তাকাতে ওঁরা দস্তুর মতো অপ্রস্তুত।

মামা সরাসরি প্রশ্ন করলেন,—ওর কি শরীর খারাপ?

মামি বললেন,—সেসব দিনগুলোর কথা মনে আছে? গিরিডিতে মাতিয়ে রেখেছিল সবাইকে।

আধঘণ্টার মধ্যেই বোম্বেটে আর ডুমের হইহল্লোড়ে বাড়ি গমগম করতে লাগল। মা ভাইপো-ভাইঝির প্রাণোচ্ছল দৌরাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে বললেন,—গিরিডির জল হাওয়ার গুণ। সত্যি দাদা, তোমার ছেলেমেয়ে দুটো দারুণ।

মামা বললেন,—তোর পাপাই কিন্তু তিনবছর আগে গিরিডি গিয়ে বোম আর ডুমকে হিপ্‌নোটাইজ করে ফেলেছিল। কত কিছু যে শিখিয়েছে ওই বয়সে, আজও বোম-ডুম তা ভুলতে পারেনি। পাপাই আজও ওদের

কাছে হিরো। আসার সময় সারা রাস্তা শুধু পাপাইয়ের কথা। কতদিন পর দেখা হবে, কত গল্প বলার আছে, কত নতুন খেলা হবে—

বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন,—বোম্বেটে পড়াশুনা কেমন করে?

—খুব ভালো। প্রথম দশজনের মধ্যে থাকে। তাছাড়া খেলাধুলো, স্পোর্টস এসবে তো ওর দারুণ নাম স্কুলে। স্কুলের ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন ও।

সে-যাকগে, পাপাইয়ের কী হয়েছে বলো তো? আমার কিন্তু ভাই মনে হচ্ছে ও ঠিক সুস্থ নেই।

সেদিন পাপাইকে স্কুলে যেতে বারণ করেছিলেন বাবা। পাপাই ব্যাগ গুছোতে-গুছোতে গম্ভীর হয়ে মুখের ওপর উত্তর দিয়েছে,—রুটিনের বাইরে তো কিছু হতে পারে না।

বলেই বেরিয়ে গিয়েছে। বাবা চমকে উঠেছেন পাপাইয়ের গলার স্বরে। এ কোন পাপাই! সত্যি, পাপাই তো সুস্থ নয়।

বিকেলে সোয়া-পাঁচটায় স্কুল থেকে ফিরল পাপাই। ডুম ছুট্টে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বলল,—ওঃ পাপাইদা, সারাদিন তোমায় মিস করেছি; এখন কিন্তু আমাদের সঙ্গে খেলতে হবে।

পাপাই ওকে আদর করে বলল,—খেলব। তুমি যখন বলছ, নিশ্চয়ই খেলব।

মুখ-হাত ধুয়ে ও খাবার টেবিলে বসল। মা বললেন,—এখন শুধু এককাপ দুধ খাও। আজ স্পেশাল হিংয়ের কচুরি হচ্ছে। সবাই মিলে ছটায় টেবিলে মিট করব।

পাপাই দুধ শেষ করে বারান্দায় এল। হালকা বাতাস দিচ্ছে। আকাশ যেটুকু দেখা যায় সেদিকে তাকিয়ে পাপাই মামাতো ভাইকে বলল,—ওই রকম আবির রঙা আকাশ আঁকা খুব কঠিন।

বোম্বেটে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল,—গিরিডিতে এর চাইতেও সুন্দর বিকেলের আকাশ দেখতে পাবি।

পাপাই মলিন মুখে বলল,—সুন্দর জায়গায় সুন্দর মানুষদের জন্য আকাশও সুন্দর হয়ে সেজে থাকবে—এটাই তো স্বাভাবিক।

বোম্বেটে বলল,—তুই নাকি আজকাল দারুণ সুন্দর ছবি আঁকিস? তোর ঘরে দেখলাম, কত পুরস্কার পেয়েছিস। আমি ছাই একদম আঁকতে পারি না। ডুম কিছু-কিছু আঁকে।

ডুম আবদারের গলায় বলল,—তোমার সেতার বাজনা শুনব কিন্তু পাপাইদা।

পাপাই বলল,—রাত জেগে থেকো, আমি বাজাব।

—ব্যাডমিন্টন খেলবে পাপাইদা?

—আমার তো র‍্যাকেট নেই।

—তাহলে এসো ক্যারাম খেলি।

পাপাই বলল,—একটু দাঁড়াও, আমি পাশের বাড়ি থেকে বোর্ড আর সঞ্জুকে ডেকে আনি। চারজন হতে হবে তো।

সেকি! তোমাদের বাড়িতে ক্যারাম বোর্ড নেই? —অবাক চোখে দাদার দিকে তাকাল ডুম ঃ তুমি ইনডোর গেম কী খেল তাহলে?

খেলি না। —নিস্পৃহ পাপাই জবাব দিল, আজ কিন্তু খেলবে আমাদের সঙ্গে।

সঞ্জুকে নিয়ে ওরা ক্যারাম খেলল। সঞ্জু আর ডুম একদিকে, বোম্বেটে আর পাপাই অন্যদিকে। যে-পাপাই তিনবছর আগে ওদের কাছে স্বপ্নের খেলোয়াড় ছিল, সে-যে এত খারাপ ক্যারাম খেলবে বোম্বেটে ধারণাই করতে পারেনি। ছোটবোন আর নতুন বন্ধু সঞ্জুর কাছে বিশ্রীভাবে হেরে গিয়ে ও অবাক।

আর-একটা গেমের প্রস্তুতিতেই ছটা বাজল। পাপাই হঠাৎ উঠে পড়ে বলল,—তোরা খেল, আর ডুম, তুই সেতার শুনবি বলছিলি না? খেলতে-খেলতে শুনতে পাবি—আমি যাই—

যেন অদৃশ্য কেউ পাপাইকে ডেকে নিয়ে গেল। ওরা অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

পাপাই নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। এখন ওর সেতার বাজাবার সময়।

মিনিট দশেক পর মা এসে দরজা ঠুকতে লাগলেন,—পাপাই, সবাই খাবার টেবিলে বসে গেছে, চলে এসো, গরম-গরম কচুরি রেডি—

পাপাই সাড়া দিল না। সেতারে ওর আলাপ চলছে।

দরজা খুলল সাতটায়। পাপাই এখন পড়ার টেবিলে। দেয়ালে সদ্য আঁকা তিনবছর আগে দেখা গিরিডির একটি দৃশ্য। কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর পড়ার বই-খাতা গুছিয়ে বসল—এক্ষুনি মাস্টারমশাই আসবেন।

কিন্তু ঘরে ঢুকলেন মামা। পাপাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,—ও-ঘর থেকে তোমার বাজনা শুনছিলাম, খুব ভালো লাগছিল।

পাপাই কিছু বলল না। মামা বললেন,—তোমার গিরিডির কথা বোধহয় কিছু মনে নেই, কত মজা করেছিলে সে-সময়।

পাপাই আঙুল দিয়ে, দেওয়ালে সেলোটেপ দিয়ে সাঁটা নতুন ছবিটা দেখাল।

—ফ্যানটাসটিক! আমাদের বাড়ির ডানদিকের ঢাল ধরে নেমে যাওয়া রাস্তাটা না?

পাপাই মাথা নাড়ল। মামা বেশ কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন,—সবার সঙ্গে খেতে এলে না কেন? স্কুল থেকে ফিরে তো কিছুই খাওনি। দাঁড়াও, আমি তোমার খাবার নিয়ে আসি।

মামা উঠতে যাচ্ছিলেন, পাপাই তাঁর হাতটা টেনে ধরল।

—কিছু বলবে?

পাপাই পেন্সিল দিয়ে রুটিনের সময়টা দেখিয়ে দিল। সাড়ে পাঁচটা খাবার টেবিলে, ছটায় সেতার প্র্যাকটি।

মামা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মনোযোগ দিয়ে সম্পূর্ণ রুটিনটা পড়লেন। সমস্ত ঘরটা তীক্ষ্ণ চোখে সার্চ করলেন। তারপর ওর মুখোমুখি বসে ওর চোখের দিকে তাকালেন। মনে-মনে শিউরে উঠলেন। খুব আস্তে জিগ্যেস করলেন,—তোমার কি মাঝে-মাঝে মাথার যন্ত্রণা হয়?

পাপাই মাথা নেড়ে জানাল,—হ্যাঁ।

—মা-বাবাকে বলেছ?

আস্তে জানাল,—না।

—কেন?

—রুটিনে নেই। কখন বলব?

চমকে গেলেন মামা। একী সর্বনাশা খেলায় মেতেছে তার বোন! রুটিন নিয়ে এমন বাঁধন?

সকাল থেকে সন্ধ্যার সমস্ত চিত্রটা যেন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে মামার কাছে। মামা পায়চারি করছেন উত্তেজনায়, পাপাই দেখছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর পাপাই বলল,—মামা, মাস্টারমশাই আসবেন এখন, তুমি যদি—

হঠাৎ যেন ঘৃতাহুতি হল। মামা রাগে কাঁপছেন। কয়েক সেকেন্ড ওর মুখের দিকে চেয়ে ওকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। ভাঙা গলায় বললেন,—অসভ্যতা, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতার একটা সীমা থাকে। তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দেয়াল থেকে রুটিন চার্টটা খামচে তুলে নিলেন। পাপাইয়ের চোখের সামনে ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে বাস্কেটে ফেলে দিলেন।

পাপাই শুধু অবাক চোখে চেয়ে একটু ম্লান হাসল। আর তক্ষুনি ওর মাস্টারমশাই ঢুকলেন ব্যস্ত হয়ে,—দশ মিনিট দেরি হয়ে গেল, বোসো, বোসো—

বলতে-বলতে মামাকে দেখে একটু

থতমত খেয়ে থামলেন। তারপরই বললেন, —ওর এখন পড়ার সময়, আপনি যদি অনুগ্রহ করে—

—দাঁড়ান, দাঁড়ান, দশ মিনিট লেট করতে যখন পেরেছেন, আরও দশ মিনিট গেলেও কোনও ক্ষতি হবে না। আপনাকে আমার দুটো কথা বলার আছে। মাস্টারমশাই, আপনার বাবা কী করতেন?

—তিনিও শিক্ষকতা করতেন। আদর্শ শিক্ষক হিসাবে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন।

—আগেকার সব শিক্ষকরাই সম্মানিত আদর্শ শিক্ষক ছিলেন।... আচ্ছা, আপনি সেই আদর্শের কতটুকু নিজের জীবনে অনুসরণ করেন?

—আপনার কথার তাৎপর্য আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—তাৎপর্য বুঝতে তো বলিনি। জানতে চেয়েছি, আপনি আপনার কুলশীল সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন কিনা।

তার মানে? —শিক্ষকমহাশয় খুবই অপমানিত বোধ করতে লাগলেন।

মামা হালকা-হাসি মুখে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন,—আপনি কুলশীল শব্দটার অর্থও বোধহয় জানেন না। সুনীতি চাটুজ্জে পড়েছেন কিছু? তাহলে জানতে পারতেন। কথাটার অর্থ আপনার পূর্বপুরুষ কী ঐতিহ্য রেখে গেছেন এবং আপনি কী ঐতিহ্য রেখে যাবেন। এরই নাম কুলশীল। আপনার বাবা যে আদর্শ শিক্ষকের ঐতিহ্য রেখে গেছেন, আপনি তা বহন করছেন কি? এতদিন এ-বাড়িতে শিক্ষকতা করছেন, এইখানে লাগানো রুটিনটা দেখে কোনও প্রতিবাদ করেননি? আপনার কি মনে হয়, আপনার পিতা এরকম রুটিনবাঁধা ছাত্রজীবনকে মেনে নিতেন? একটি বারো বছরের বালকের উপর জঘন্যতম অত্যাচারের শরিক আপনিও।

রাত্রে খেতে বসে মা অনুযোগ করলেন, —এমন বেয়াড়া ছেলে হয়েছে যে-সন্ধেবেলা সবার সঙ্গে খেতে ডাকলাম, সে ঘর থেকেই বেরোল না। সাড়ে পাঁচটায় শুধু এককাপ দুধ খেয়েছে—

মামা বললেন,—ওইটাই তো ওর রুটিন সময়। সে-সময় ওর খাবার হয়নি কেন?

—বাবে, তোমরা এলে, একটু ভালোমন্দ রান্না করব না? একসঙ্গে বসে খাব না?

—ওর রুটিনে তো সে-সময় বরাদ্দ করা নেই।

বাবা মাথা নিচু করে রইলেন। মা থতমত খেয়ে চুপ।

মামা বললেন,—শোনো, আমি এক সপ্তাহ ছুটি নিয়ে এসেছি। কিন্তু বেড়াবার শখ আমার মিটে গেছে। আমি আগামীকালই গিরিডি ফিরে যাব। পাপাই আমার সঙ্গে যাবে।

মা-বাবা দুজনেই চমকে উঠলেন। মা বললেন,—বছরের এই মাঝখানে, এখন কি বেড়াতে যাবার সময়?

—আমার ছেলেমেয়েরা আসেনি? নাকি তাদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই? শোনো, পাপাই বেড়াতে যাচ্ছে না, যাচ্ছে মানুষ হতে। তোমরা বাবা মা হবার যোগ্যতাই অর্জন করোনি। ভুলে যেও না, আমি ডাক্তার। এখানে এসেই বুঝেছি পাপাই অসুস্থ। আর তার জন্যে তোমরাই দায়ী। তোমাদের পাল্লায় পড়েই ওর এই অবস্থা।

সেইসঙ্গে তোমাদেরও একটু চিকিৎসার দরকার। তোমরাও আমার সঙ্গে চলো।

পাপাই, কাল সকালে তোমার যা নেবার গুছিয়ে নেবে, বিকেলে আমরা সবাই মিলে গিরিডি রওনা হব।

ছবি ঃ দেবকী

জগত দেবনাথ

দড়ি বাঁধা ঘড়ি

গোরাদাদুর ঘড়ি পরার সখ ছিল। অবশ্যি ‘পরা’ বলাটা ঠিক হবে না। কারণ সেকালে অর্থাৎ আজ থেকে ৫০-৬০ বছর পিছনের কালে আমাদের দেশে ঘড়ি পরা হতো না হাতের কবজিতে। পরা বলতে এখানে বাঁধা। তখন ঘড়ি বাঁধা থাকত সরু কিন্তু শক্ত দড়ি কিংবা চেন দিয়ে জামার পকেটের সঙ্গে। বুকের উপর। ঘড়িটি কিন্তু দৃশ্যমান থাকত না। ঘড়ি থাকত পকেটে। বুক পকেটের ভিতরের দিকে আরেকটি পকেট তৈরি করত দরজিরা। পকেটের ডান পাশে ছোট্ট কাটা মুখ থাকত ঘড়িটি ঢুকিয়ে রাখার জন্য। প্রয়োজন মতো বের করে সময় দেখা হতো।

আমাদের গোরাদাদুর ঘড়িও অমনি করে বাঁধা থাকত বুক পকেটে। গোরাদাদু হলেন গজুমামার কাকা। গজুমামার কাকা আমাদের সম্পর্কে দাদুইতো। তা আমাদের ছোটবেলায় তাঁকে অনেক দেখেছি। গোরাদাদু চাকরি করতেন বি. এন. আর অফিসে। রেল অফিসের চাকরি। তাতে আবার শৌখিন মনের মানুষ। সুখী মনেরও বটে। সর্বদা ফুরফুরে মন গোরাদাদুর। শালিক চড়ুই পাখিদের মতো। তির-তির করেই যাচ্ছে সারাক্ষণ। আমি গোরাদাদুর বাড়ি গেলে পরে থাকতাম দু-একদিন। মাঝে-মাঝে দাদুকে সময় জিগ্যেস করতাম। দাদু বেশ বিজ্ঞ মুখভাব করে বারান্দা থেকে উঠে ঘরের ভিতরে যেতেন। ফুলহাতা কিংবা হাফহাতা-শার্ট অথবা পাঞ্জাবি—যখন যে জামার পকেটে ঘড়িটি থাকত, গিয়ে বের করতেন। সময় নিরীক্ষণ করতেন বেশ নিবিষ্ট মনে। তারপর বলতেন—‘ইট ইজ্ টেন মিনিটস্ টু টেন।’

সাহেবি মেজাজ তখন। তাই জবাব আসত ইংরাজিতে।

আমি আর ছোটমাসি দেখেশুনে মুচকি হাসতাম। এই যে-সময় জিজ্ঞাসা করা। জামা গায়ে না থাকলে, বিশেষ করে বাড়িতে থাকাকালীন উঠে গিয়ে সময় দেখা ওই পকেট ঘড়ি বের করে, এতে গোরাদাদু বিরক্ত হতেন না। বরং যেন খুশিই হতেন। একটা কাজের কাজই করছেন এমনভাব দেখা যেত চোখে-মুখে। এটা একটা অবশ্য কর্তব্য মনে করতেন তিনি। অন্য কাউকে কখনও বলতেন না—দেখতো রে—ঘড়িটা বের করে, কটা বাজল! নিজে দেখে বলবেন। দেরি হলেও। কাজ থাকলেও হাতে।

বারান্দায় বসতেন দাড়ি কামাতে। দুহাঁটুর ফাঁকে ছোট কাঠের ফ্রেম লাগানো আয়না। চেপে ধরা আছে। ‘লাইফ বয়’ সাবানের টুকরো অ্যালুমিনিয়ামের বাটির জলে ভিজিয়ে দুগালে বোলাতেন। ক্রমশ ফেনা তৈরি হয়ে দুগাল সাদা হয়ে যেত। তারপর দাদু একান্তভাবে নিজের ক্ষুরটি বাগিয়ে ধরে খ্যারখ্যার করে দাড়ি কামাতেন। আমি সবিস্ময়ে দেখতাম চেয়ে-চেয়ে। দেখতাম সেলুনের কিংবা বাড়ি-বাড়ি ঘোরা নাপিতরা যে দক্ষতায় দাড়ি কামিয়ে দেয় দাদুও প্রায় একই স্টাইলে নিজের গালে, গলায় ক্ষুর—চালাতে অভ্যস্ত। আবার মজার ব্যাপার দেখেছি। ছুটির দিনে দাদু বাজারের সেলুনে যেতেন দাড়ি কামাতে। সেদিন বাড়িতে দাড়ি কামাতেন না। আর তখন সঙ্গে করে খাপে ভরে নিয়ে যেতেন ওই ক্ষুরটিও। আমি থাকলে সঙ্গে যেতাম। একবার বলেছিলুম,—দাদু, আজ তো ছুটির দিন। আরাম করে বাড়িতে যতক্ষণ ইচ্ছে বসে দাড়ি কামাতে পার। আর সেলুনেই যখন যাচ্ছ তখন নিজের ক্ষুরটি ব্যবহার করার কী দরকার?

দাদু হেসে বললেন,—আরে, ছুটির দিনে আরাম করে, সময় নিয়ে, জুত করে দাড়ি কামাতেই যাই সেলুনে। কেমন চেয়ারে গা এলিয়ে, ঘাড় ফেলে বসে থাকব। নাপিত আদর করে দাড়ি কামিয়ে দেবে। মুখ ধুয়ে দেবে। বাড়িতে তাড়াহুড়ো করে কাজ সারতে হয়। অফিস যাওয়ার তাড়া থাকে না-কি? একটা দিন নিজে হাতে নাই-বা করলাম ওই কাজ। ওদের হাততো ভালো। তুই যখন চাকরি করবি তখন বুঝবি। অকাট্য মনে হতো গোরাদাদু এ-হেন যুক্তি।

একদিন ওইরকম বাড়িতে দাড়ি কামানোর সময় পাশের বাড়ির কালীপদর মা এল। জিগ্যেস করল,—এখন কটা বাজে বলুন তো? বলেই কালীর মা লজ্জা পেল। কারণ দাদু ব্যস্ত রয়েছেন। দাড়ি কামাতে বসেছেন।

তো কি আছে, দাদুর চোখ আছে সেদিকে। বললেন,—কী হয়েছে?

কালীপদর মা সসংকোচে এগিয়ে এসে বলল,—ওই কোবরেজ বলেছে তিন ঘণ্টা পরপর মানুকে বড়ি খাওয়াতে। তাই এখন কটা বাজল জেনে রাখি।

দাদু চট করে উঠতে পারলেন না। চোখ আয়নাতে। ডান হাতে ক্ষুর। তবু

কাউকে বলবেন না—দ্যাখ তো, কটা বাজে ঘড়িতে।

ফলে আরও দু-তিনটে টান দিয়ে ক্ষুর রাখলেন। গাল মুছে উঠলেন। ঘরের ভিতরে গেলেন। ঘড়ি বের করে দেখলেন। সময় বললেন,—আটটা বেজে বারো। বুঝলে কালীর মা। ওই আটটাই ধরো।

দাদু বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। বসলেন আবার। ঘড়ি দেখাটা একটা বিশেষ কাজই যেন। উঠতে-যেতে-দেখতে যে-সময় গেল, ওসব কিছু ধর্তব্য নয়।

মুখ মণ্ডল নিরীক্ষণ করতে- করতে বললেন ঃ এরপর তিন ঘণ্টা মানে এগারোটার সময় খাওয়াবে। বুঝলে! তখন কিন্তু আমি থাকব না বাড়িতে।

কালীর মা ঝটপট বলে দিল—সে তখন আমি বামুন বাড়ি গিয়ে জেনে আসবখন। ওদের তো ঘণ্টা ঘড়ি রয়েছে।

ঘণ্টাঘড়ি অর্থাৎ পেন্ডুলাম ঘড়ি। দেওয়ালে টাঙানো। বামুন বাড়ি একটু দূরে। ও পাড়ায় বলা যায়। যেতে-আসতে দশ-পনেরো মিনিট কেটে যাবে। তাহলেও মোটামুটি সময় মেনে খাওয়ানো হবে। সেকালে এমন অবস্থাই ছিল শহরে গঞ্জের ঘরে-ঘরে।

একবার দাদুর বাড়ি গিয়েছি গরমের ছুটিতে। দেখি, গোরাদাদুর সখের ঘড়ি সরু সোনার চেনে বাঁধা। দারুণ দেখাচ্ছে। হঠাৎ সোনার চেন? ঘড়ির জন্য! বললাম,—দাদু! ঘড়ি তোমার পুরনো হচ্ছে। এখন সোনার চে লাগিয়েছ বড়?

গোরাদাদু চোখ ঠেরে বললেন,—চাকরিতে প্রমোশান হয়েছে রে জগা। তুই কী বুঝবি। যখন চাকরি করবি বুঝতে পারবি প্রমোশান পাওয়ার আনন্দ কেমন হয়। কী সুখ! ওই আনন্দে ঘড়ির গলায় সোনার চেন হল।

আমাদের রাঙাদিদিমা কাছেই বসেছিলেন, দাদুর জামার হাতায় বোতাম

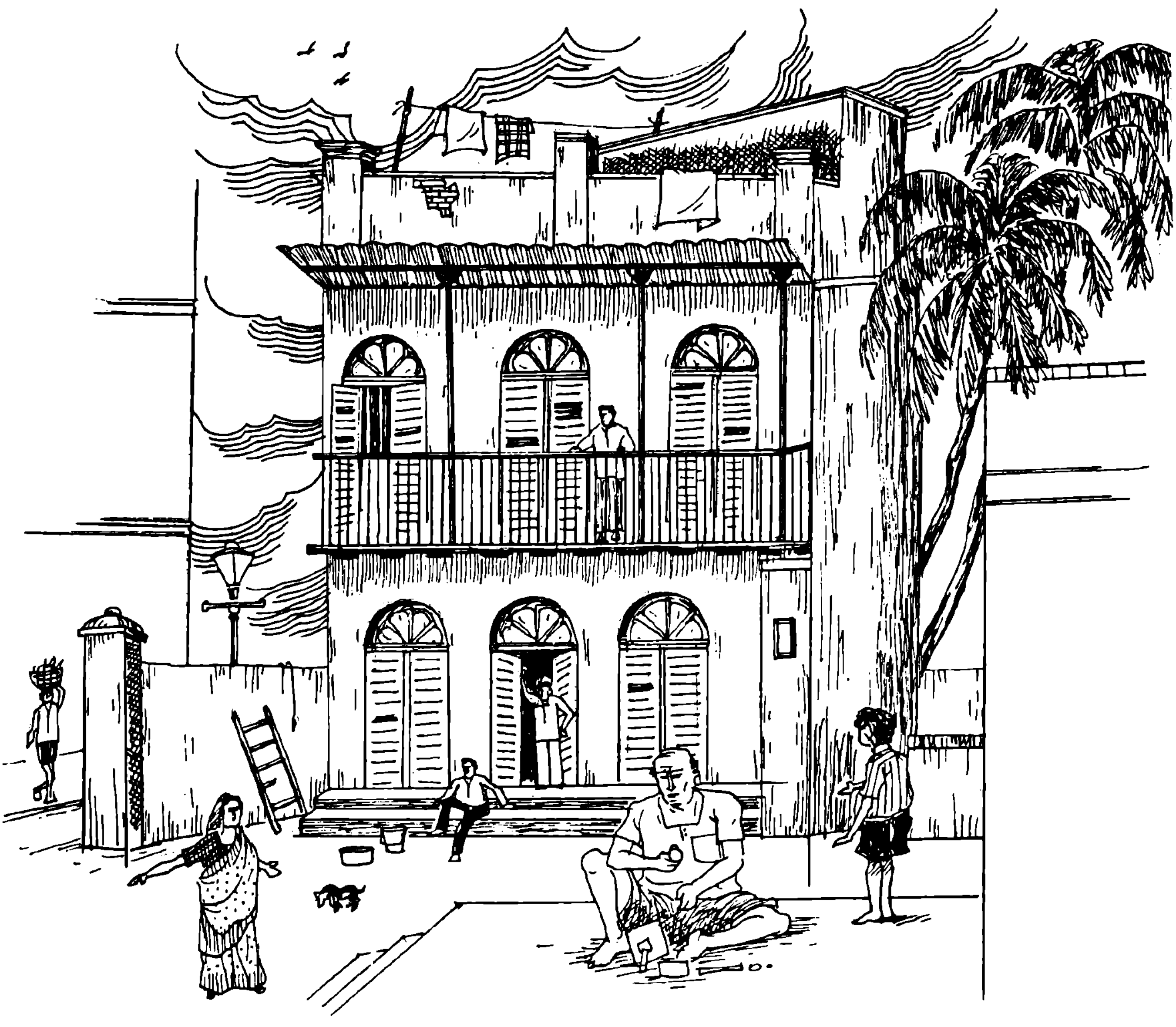

লাগাচ্ছিলেন। আমাদের কথাবার্তা সবই শুনছিলেন। রাঙাদিদা বেশ পাকা অভিনেত্রীর মতো করে অভিমানী গলায় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—হ্যাঁরে জগা, তাই দেখছি। পেয়ারের ঘড়ির গলায় সোনার চেন। আমার গলায় কালো সুতোও জোটেনি সারা জীবনে।

—কী! মিথ্যে কথা বলো না। তোমাকে সোনার চেন গড়িয়ে দিইনি? —দাদু তড়বড়িয়ে বলে উঠলেন।

রাঙাদিদা কবুল করলেন। বললেন,—হ্যাঁ, তা দিয়েছ। সেই কোন্ তিরিশ বছর আগে।

ঘড়িতে সোনার চেন লাগিয়ে গোরাদাদুর গর্বে মাটিতে পা পড়ে না। প্রথম কিছুদিন তো বাড়িতে জামাকাপড় পরে ফিটফাট হয়ে বসে থাকতেন। বাইরে থেকে এসে তৎক্ষণাৎ জামা কাপড় বদলাতেন না। বারবার পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখতেন। আসলে হাতে স্পর্শ করে সুখ পেতেন। কিন্তু ওই সুখ বেশি দিন সইল না গোরাদাদুর কপালে।

গোরাদাদু যাবেন গয়ায়। গয়ায় গিয়ে ফল্গু নদীর পাড়ে তাঁর পূর্বপুরুষদের পিণ্ডদান করবেন। দাদু পিতৃদেব ও মাতৃদেবীকে পিণ্ডদান করবেন। দুজনে গত হয়েছিলেন দাদুর তরুণ বয়সেই। তখন সদ্য চাকরিতে লেগেছিলেন। তার পর যাব-যাব করতে-করতে আর যাওয়া হয়নি। বহুবছর গড়িয়ে গেছে। গোরাদাদু মনস্থির করেই ফেললেন এবার।

হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠলেন। গয়ায় নামবেন পরদিন সকালে। গাড়ি ছাড়ার পর বাড়ি থেকে আনা হালকা লুচি তরকারি খেয়ে নিলেন বাংকে বসে-বসে। খাওয়া সেরে মুখ-হাত ধুয়ে এসে চাদর পাতলেন সিটের উপর। মাথার তলায় হাতব্যাগ দিয়ে শুয়ে পড়লেন দাদু। রেলের চাকুরে। ভাবখানা যেন, আমাদেরই গাড়িতো।

গাড়ির দুলুনিতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই দাদু ঘুমিয়ে কাদা। ঘুম ভাঙল সেই কোড়রমা স্টেশনে। তখন ভোর। প্রথমে মুখ বাড়িয়ে জিগ্যেস করলেন—কোন্ স্টেশন হ্যায়?

নিচের সিট থেকে কেউ স্টেশনের নাম বলল। গোরাদাদু ভাবলেন—এখনওতো গয়া পৌঁছাতে অনেক সময় বাকি। তিনি পুনরায় চোখ বুজলেন।

আচমকা খেয়াল হল কটা বাজল বটে! দেখা দরকার। রেলে আলো টিমটিমে হলেও দাদু উপরের বাংকে থাকার ফলে আলোটা কাছে ছিল। ডান হাত বুকের উপর এনে ঘড়ি বের করতে গিয়ে দেখেন ঘড়িতো নেই পকেটে। ঘড়ির চেনে হাতই লাগছে না। তড়াক করে উঠে বসলেন তিনি। পকেটে ঘড়ি নেই। চেন নেই।

দাদু বুঝতে পারলেন, তাঁর ঘড়ি চুরি হয়ে গেছে। নেমে এলেন নিচে। সহযাত্রীরা কেউ ঘুমে ঢুলছে। কেউ চা খাচ্ছে। দাদু বললেন,—হামারা ঘড়ি চুরি হো গিয়া।

আর বলে কি হবে! বললেই কে আর কী করতে পারেন। চোর তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায় চেন কেটে কিংবা ছিঁড়ে ঘড়ি নিয়ে গেছে। কেটে পড়েছে কখন সে, কে জানে। খুব মন খারাপ হয়ে গেল গোরাদাদুর। অমন সখের ঘড়ি। তাতে আবার সাধ করে সোনার চেন লাগিয়েছিলেন। সব গেল। লোকে বলে গয়াতে চোর-গুণ্ডাদের আড্ডাখানা। তা গয়া পৌঁছাবার আগেই তো সব হাওয়া হয়ে গেল।

গাড়ি ছেড়েছে আবার। গোরাদাদু বেজারমুখ করে বাংকে উঠতে গেলেন। তখনি দেখলেন তাঁর ঘড়িটি পড়ে আছে পাতা চাদরের উপর। চেন নেই। দাদুর বুকের ভিতরে গুরগুর করতে লাগল। এদিক-ওদিক তাকালেন। খুঁজলেন। না, চেন পেলেন না। বোঝা গেল—ঘড়ি নয়—চোরের 'টারগেট' ছিল ওই সোনার চেনটি। ঘড়িটি তার কাছে মূল্যবান নয়। তার প্রয়োজন ছিল শুধু সোনার চেনটি। তাই ঘড়িটি রেখে গেছে।

গোরাদাদু ঘড়িটি হাতে তুলে দিয়ে বাবু হয়ে বসে রইলেন। ভাবতে লাগলেন—যাক। হিসেবি চোর বলতে হবে। এরপর তো চোরেদের এলাকায় গিয়ে পড়তে হবে। নাকি রাজত্বেই। ওরা অবশ্যি ঘড়িটিও ছাড়বে না।

আমি এসব কাহিনী গোরাদাদুর বাড়ি গিয়ে রাঙাদিদার কাছে শুনেছিলাম। দিদা বললেন,—দ্যাখ্ গে। ঘড়ির গলায় দড়ি এখন।

আমি দেখলাম দাদুর ঘড়িটি আবার কালো সুতোয় বাঁধা। ন্যাড়া মাথা দুলিয়ে গোরাদাদু বললেন,—হ্যাঁ। অভিজাত চোর। ঘড়িটি রেখে গেছে। আমি ফিরে এলাম। গয়া যাওয়া বাতিল করলাম। ঘড়িটি খোয়াতে চাই না। পূর্বপুরুষকে পিণ্ডদান পরে হবে। কালীঘাটে করে নেওয়া যাবেখন। গয়ার চোরেরা আমায় জীবন্তই পিণ্ডি চটকাবে। তাই গোমো জংশনে নেমে কলকাতার টিকিট কেটে ফিরে এলাম।

ইতিমধ্যে অবশ্যি কালীঘাট গিয়ে পিণ্ড দান সেরে এসেছেন। আমি বললাম,—আর সোনার চেনের দরকার নেই। রূপোর একগাছি গড়িয়ে নাও দাদু।

গোরাদাদু গম্ভীর গলায় বললেন,—না-না! সোনাও নয়—রূপোও নয়। দড়ি বাঁধা ঘড়িই ভালো। নিরাপদ। বুঝলি জগা।

আমি বললাম,—দাদু, বলেছ ভালো। দড়ি বাঁধা ঘড়ি। তবে আমাদের কালে ও অচল বটে।

ছবি : সুদীপ্ত মণ্ডল

প্রকাশিত হয়েছে

প্রদীপ্ত সেন

আমাদের সঙ্গীসাথী ৫০.০০

কুট্টিমামার কত কাণ্ড ৫০.০০

মানুষতো একা বাঁচতে পারে না। যুগ-যুগ ধরে তার কাছে এসেছে চতুষ্পদ প্রাণীরা। এমনই সব সাথীদের সব্বাইকে নিয়ে এ-যেমন রঙিন ছবিতে ভরপুর গল্পে টানটান বই। **দ্বিতীয় বইটি** এক আশ্চর্য খ্যাপাটে চরিত্র কুট্টিমামাকে নিয়ে। যে অবলীলায় গুল-গল্পের মাধ্যমে বলে চলে বিজ্ঞানের অজানা সব বিষয়। মজা আর জানার আনন্দ মিলেমিশে হয় একাকার।

পত্র ভারতী ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

সঙ্কর্ষণ রায়

ঘাস

১৯৮২ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি নাগাদ হায়দ্রাবাদ গিয়েছিলাম বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বিষয়ক সর্বভারতীয় সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য। ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ তার উদ্যোক্তা।

কলকাতা (হাওড়া) থেকে যাত্রা করি ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেসে। তখন বর্ষাকাল হলেও উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশে বৃষ্টিবিহীন রিক্ততা। রৌদ্রদগ্ধ ধানের খেতের মধ্যে যেন আকাশের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে-শস্যশূণ্য খেতের পাশেই পাতায় ভরা আম, জাম, নারকেল ও সুপারি বাগান যেন মরুবিজয়ের কেতন উড়িয়েছে। অবাক হয়ে দেখতে থাকি।

পরদিন সন্ধ্যায় হায়দ্রাবাদের পাশের শহর (ইংরেজিতে যাকে বলে টুইল সিটি) সেকেন্দ্রাবাদে আমাদের ট্রেন পৌঁছবার কথা, কিন্তু পথে হল দেরি। বিকেলে সেকেন্দ্রাবাদ থেকে কিছু দূরে ভোঙ্গিরে পৌঁছে গাড়ি ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'কী ব্যাপার?' আমার এ-প্রশ্নের জবাবে কামরার অ্যাটেন্ডেন্ট বললে যে একদল বানজারা মেয়েমানুষ রেললাইনের ওপরে বসে 'রেল রোকো' আন্দোলন করছে। 'কেন'? আমার এই প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারে না।

গাড়ি থেকে নেমে অন্ততপক্ষে শ-খানেক বানজারা মেয়েমানুষকে তাদের কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে রেললাইনের ওপরে বসে থাকতে দেখি। প্রত্যেকের পরনে চোখ-ধাঁধানো রঙিন পোশাক। কানে, নাকে, গলায়, হাতে ও পায়ে রুপো ও গালার গয়না, পুঁতি ও পাথরের মালা। ওরা নড়াচড়া করলেই বেজে ওঠে ধাতব শব্দের মৃদু ঝংকার মাঝে-মাঝে সেই শব্দকে ছাপিয়ে ওঠে তাদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত কোলাহল। আমার একজন সহযাত্রী বললেন, —ওরা স্লোগান দিচ্ছে...

কিসের স্লোগান? কেন স্লোগান? এ উত্তর আমাদের প্রথম শ্রেণীর কামরার কারুরই জানা নেই। কামরার অ্যাটেনডেন্ট স্থানীয় মানুষ হলেও এই বানজারা স্ত্রীলোকরা কী চায় বলতে পারে না।

গাড়ি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে রেললাইনের ধারে লম্বা একটা গ্র্যানাইটের পাহাড়। নেড়া নিস্তৃণ পাহাড়ের মাথায় কেল্লার ভগ্নাবশেষ; হয়তো মুসলমান কোনও নবাব বা নিজাম কর্তৃক নির্মিত। কয়েকটি কবরও চোখে পড়ে, মুসলমানদের গোরস্থান।

পাহাড়টি সুদূরপ্রসারী। রেললাইনের সমান্তরাল। সম্ভবত পরের স্টেশন পর্যন্ত প্রসারিত। অদূরে পাহাড়ের নিচে খেজুরের বাগান। বাগান না-বলে বনই বলা উচিত, কারণ প্রচুর গাছপালার সমাবেশ ঘটেছে। এখানে বানজারাদের একটি বস্তিও দেখা যাচ্ছে। শুকনো ঘাস দিয়ে ঝুপড়ি তৈরি করে তার মধ্যে বাস করে এক-একটি পরিবার। শুনেছি, বানজারারা যাযাবর, এক জায়গায় বেশি দিন থাকে না। কাজেই ঝুপড়িগুলি তাদের অস্থায়ী আবাস।

কিন্তু এই অস্থায়ী আবাসগুলিকেই তারা স্থায়ী ঘরবাড়িতে পরিণত করতে চায়, —বললেন অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্য মানবকল্যাণ বিভাগের অসমীয়া সচিব সিদ্ধেশ্বর কাকতি। তিনি বানজারা স্ত্রীলোকদের এই সত্যাগ্রহ সরজমিনে তদন্ত করে আমি যে-কামরায় ছিলাম, সেই কামরায় উঠেছিলেন। বললেন, তাদের এই দাবির গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তারা হত্যাগ্রহ করছে।

হত্যাগ্রহ মানে? —আমার বিস্মিত-প্রশ্ন।

—হত্যাগ্রহ নয়, হত্যাগ্রহ...

অর্থাৎ সিদ্ধেশ্বর হত্যাগ্রহ নয়, সত্যাগ্রহ বলতে চাইছেন, তাঁর অসমীয়া উচ্চারণে 'স' 'হ' হয়ে যাচ্ছে।

তিনি সত্যাগ্রহকারী মহিলাদের উদ্দেশে বলেছিলেন যে তারা যতই সত্যাগ্রহ করুক না-কেন, তাদের পুরুষরা স্থায়ী ঘরবাড়ি চায় না।

চাইবে না-কেন! —স্ত্রীলোকদের একজন প্রত্যুত্তরে বলেছিল,—আমরা চাইলে তারা চাইতে বাধ্য। ...সে যাই হোক, আপাতত আমরা এমন ঘাস চাইছি যা গরু-ছাগল খায় না। আমাদের ঝুপড়ির ছাদের ঘাস আমাদের পোষা গরু-ছাগল খেয়ে ঘর নষ্ট করে ফেলছে।

—কই এতদিন তো এ-কথা শুনি নি তামাদের কাছ থেকে।

তাদের একজন বলেছিল,—এতদিন একজায়গায় বেশিদিন থাকিনি, কাজেই এ কথা বলার দরকার হয়নি। কিন্তু এ-বছর আমরা এখানে অনেকদিন থাকব ঠিক করেছি, দরকার হলে চিরকাল।

—অতএব গরু-ছাগলের কাছে অস্পৃশ্য ঘাস খুঁজে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি ওদের রেললাইন থেকে উঠে আসতে রাজি করিয়েছি।

শেষ অবধি আবার চলতে শুরু করে ট্রেন। বোঝা যায় রেললাইন থেকে উঠে এসেছে বানজারা স্ত্রীলোকেরা।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরালেন সিদ্ধেশ্বর। নিঃশব্দে খানিকক্ষণ ধূমপান করার পর তিনি বললেন,—ওরা তো ওদের হত্যাগ্রহ বন্ধ করেছে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি কী করে? পৃথিবীতে এমন কোনও ঘাস আছে কি যা গরু-ছাগলেও খায় না? এ-সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা আছে কি?

না। —আমি জবাব দিলাম ঃ তবে জানার চেষ্টা করতে এবং খুঁজে দেখতে পারি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে হায়দ্রাবাদে আমি দিনসাতেকের বেশি থাকব না, থাকলেও ব্যস্ত থাকব অন্ধ্র ভাষা পরিষদ ভবনে সর্বভারতীয় বিজ্ঞান পরিভাষা নিয়ে আলোচনায়। যাকে বলে খোঁজাখুঁজি তা করতে পারব মেঘালয়ে ফিরে গিয়ে।

আপনি আমার দেশের মানুষ? —রুদ্ধশ্বাস আগ্রহে প্রশ্ন করেন সিদ্ধেশ্বর।

—না, মেঘালয়ের রাজধানী শিলং আমার কর্মক্ষেত্র।

—আমি অসমের মানুষ হলেও আমার বাড়ি শিলঙে। কিন্তু আপনি শিলঙে খোঁজাখুঁজি করে বিষাক্ত ঘাস পেলে হায়দ্রাবাদে আমার কী লাভ বলুন!

—লাভ হল এই যে, ওই ঘাসের নাম ও গোত্র আপনাকে লিখে পাঠালে আপনি আপনার লোকজন লাগিয়ে তা খুঁজে বের করতে পারেন...

—খুঁজে বের করার চেষ্টা এখন থেকেই করব। মুখ্যমন্ত্রীকে বলে শুরু করব অপারেশন পয়জনাস গ্রাস (Operation Poisonas Grass) প্রজেক্ট।

সেকেন্দ্রাবাদে ট্রেন পৌঁছল অনেক রাত্রে। স্টেশনে আমাদের হায়দ্রাবাদ দপ্তরের আমার জনৈক সহকর্মী সুভাষ রায়ের ব্যবস্থামতো একটি জিপ হাজির ছিল, সেই জিপ আমাকে নিয়ে গেল সেন্ট্রাল হিন্দি ইন্স্টিটিউটের বিশ্রামগৃহে। সেখানে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, আছে শুধু শোওয়ার সুবন্দোবস্ত। কাজেই না-খেয়ে শুয়েই রাত কাটাই।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি। যে-জিপ আমাকে সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশন থেকে এই বিশ্রামগৃহে নিয়ে এসেছিল, সেই জিপই হাজির হয়েছে। ড্রাইভার বললে যে, সুভাষের নির্দেশমতো এসেছে সে আমাকে সুভাষের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

সুভাষের বাড়িতে গিয়ে সবার আগে অনশন ভঙ্গ করি। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদুমন্দ হাসতে-হাসতে সুভাষ বললে,—বুঝতে পারছি আপনাদের সম্মেলনের উদ্যোক্তারা ভুল জায়গায় আপনার থাকার ব্যবস্থা করেছে, অবিলম্বে আর কোথাও যান।

গেলাম ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্রামগৃহে। সেখানে আমার থাকা ও খাওয়ার নিখুঁত ব্যবস্থা হল। চিন্তাটা আমার মাথায় ছিল, বিশ্রামগৃহের একটি ঘরে আমার জিনিসপত্র রেখে বিশ্রামগৃহের সামনে বাগানের মধ্যে রকমারি গাছপালা দেখতে-দেখতে বাগানের বাইরে আগাছার দিকে নজর ফেলি। এখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আগাছা ও ঘাসের বন। এত লম্বা ঘাস আগে কোথাও দেখিনি। দেখে মনে হয় যেন মধ্য আফ্রিকার ঘাসবনের 'এলিফ্যান্ট গ্রাস (elephant grass)। বিশ্রামগৃহের বাগানের সীমানার বাইরে এই ঘাস রীতিমতো ঝোপ-জঙ্গল সৃষ্টি করেছে।

সুদৃশ্য বাগানের পাশে বন্য-ঘাসবনের এই সহাবস্থান সত্যি বিস্ময়কর। এই ঝোপ-জঙ্গল কি ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বনসৃজন পরিকল্পনার রূপায়ণ?

ঘাস বনটাকে কাছ থেকে দেখার জন্য বাগানের সীমানা পেরিয়ে বনের মধ্যে ঢুকি। লিওনার্ড উইবার্লির (Leonard Wilberly) লেখা 'Meeting with a great Beast' বইয়ে বর্ণিত আফ্রিকার ঘাসবনের সঙ্গে এই ঘাসবনের মিল আছে। কিন্তু পার্থক্য আছে একটা। আফ্রিকার ঘাসবন সর্বদা সংগীতময় (the grass of Africa sings), ঝিঁ-ঝিঁ পোকা সহ অসংখ্য কীটপতঙ্গ ও পাখির ডাকের ঐকতানে সর্বদাই মুখর হয়ে থাকে আফ্রিকার ঘাসবন। কিন্তু এখানকার এই ঘাসবন সম্পূর্ণ নিঃশব্দ। কীটপতঙ্গ বা পাখিরা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এখানে। কেন?

আমার এই প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাই ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীর কাছে। এই ঘাসবনের মধ্যে তিনি তখন সমীক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপে রত। তাঁকে প্রশ্ন করে জানতে পারি যে এই ঘাস বিষাক্ত; মাটিকেও বিষাক্ত করে তুলেছে। শোনা যায়, দক্ষিণ আমেরিকার তৃণভূমিতে এই ঘাস সাধারণ ঘাসকে নষ্ট করে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মাটিকে বিষিয়ে দিয়েছিল। উত্তর আমেরিকা থেকে আমদানি করা গমের সঙ্গে নাকি এই ঘাসের বীজ এসেছে। কী করে এসেছে এবং তা আমদানি করা গমকে কতখানি বিষাক্ত করে তুলেছে তা অবশ্য জানা নেই। আমেরিকার রপ্তানিকারী খাদ্য বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ আমেরিকার ঘাসবন থেকে আহরণ করা এই বিষাক্ত ঘাসের বীজ গমের সঙ্গে কেন মিশিয়ে দিয়েছিল তাও তখনও পর্যন্ত (জুলাই ১৯৮২) জানা যায়নি। হয়তো তৎকালীন ভারতবিরোধী আমেরিকা, ভারতীয়দের বিষাক্ত গমের রুটি খাইয়ে দুর্বল ও বিকলাঙ্গ করে তুলতে চেয়েছিল।

যে গমের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল বিষাক্ত ঘাসের বীজ, তার পুরোটাই এসেছিল অন্ধ্রপ্রদেশের এই প্রদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের অন্নাভাব মেটাবার জন্য। হায়দ্রাবাদের শস্যাগার থেকে হয়েছিল তার বিতরণ। স্পষ্টত বিতরণের সময়ে বিষঘাসের বীজ ছড়িয়ে পড়েছিল হায়দ্রাবাদের মাটিতে এবং বিষাক্ত ঘাসবন সৃষ্টি করেছিল ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে।

এখন প্রশ্ন, শহরময় রোপিত হয়েও বিশেষ একটি জায়গায় তা বিষঘাস সৃষ্টি করেছিল কেন?

এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞানী। তাঁর সমীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে জানার আগে তাড়াতাড়ি টেলিফোনে সিদ্ধেশ্বর কাকতিকে এই ঘাস সম্পর্কে অবহিত করে তাঁকে এই ঘাস দিয়ে বানজারাদের ঝুপড়ি তৈরি করার পরামর্শ দিই। সঙ্গে-সঙ্গে সিদ্ধেশ্বর চলে আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্রামগৃহে এবং বিষাক্ত ঘাসবনের ঘাস উদ্ভিদবিজ্ঞানীর দ্বারা বিষাক্ত বলে ঘোষিত হতেই এই ঘাস কেটে ভোঙ্গিরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।

ভোঙ্গিরে বানজারাদের আস্তানার কাছে বিষাক্ত ঘাস এনে জড়ো করার পর তাদের পোষা গোরু-মোষ-ছাগলদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। এই ঘাসের গন্ধ থেকেই তারা বুঝতে পারে যে এই ঘাস বিষাক্ত। আতঙ্কের তাড়নায় তারা পালিয়ে যেতে উদ্যত হয়, বলপ্রয়োগ করেও তাদের কেউ ধরে রাখতে পারে না। অগত্যা পোষা-পশুদের অনুসরণ করে বানজারারাও ভোঙ্গির ছেড়ে চলে যায়...

ছবি ঃ অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আগমনি

রোদ্দুরে ওই মেঘের পরত,
ঠিক বুঝেছি এল শরৎ,
কাশের বনে দুগ্‌গা-অপু,
রেলগাড়ি, তালপাতার ভেঁপু।

শিশির ভেজা দূর্বাঘাসে,
কমলা ঠোঁটের শিউলি হাসে,
ঝিনুক রঙের শঙ্খচিলে,
সাতনরি হার পরিয়ে দিলে।

ওমনি আকাশ শ্যামলী মেয়ে,
পাল তুলে সব আসছে নেয়ে,
নাচ দেউলে পোটোর ঠাকুর,
স্মৃতির ঢাকে নকেতা-নাকুড়।

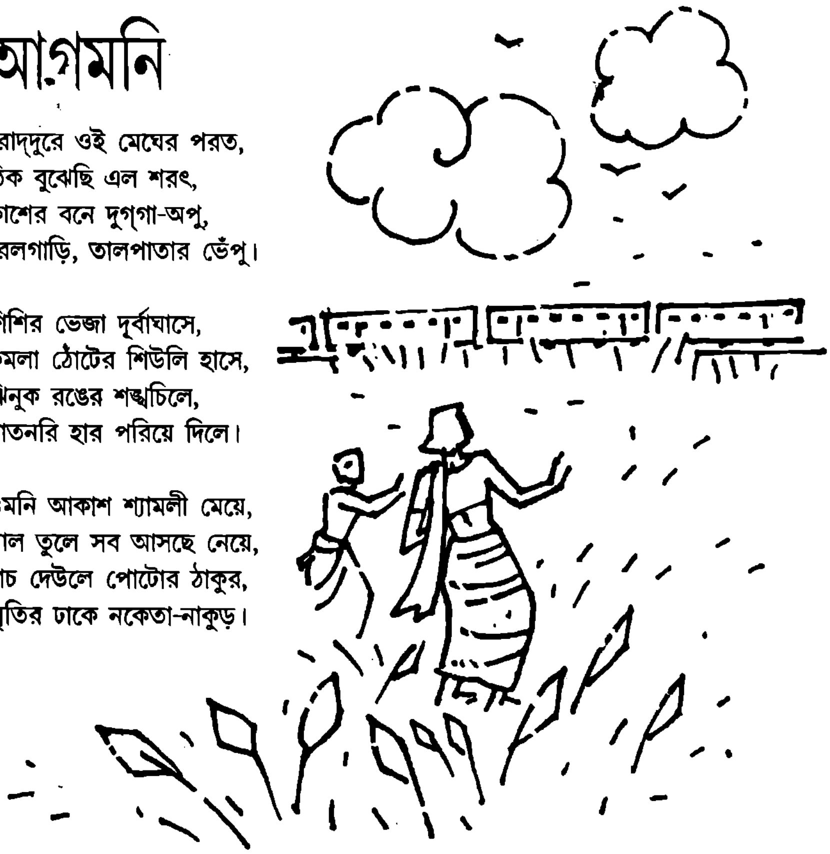

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

ভালবাসা-ই পারে

রাতের বেলা মাংস-লুচি,
দুপুরবেলা ফিস্টি,
সকাল-বিকেল জলখাবারে
জমিয়ে দই-মিষ্টি।
ঘুরছ, ফিরছ, পড়ছ, খেলছ
দিব্যি হেসে-হেসে,
খবর রাখ? দেশের মধ্যে
বাপ রে! সর্বনেশে
জ্বলছে আগুন, পুড়ছে তোমার
ভাইবোনেরই ঘর,
ভিন্ন ভাষা, অন্য পোশাক
হোক, তবু নয় পর।
ছোট্ট তুমি, একটুখানি,
মস্ত এ-কান্তারে—
ভালবাসো, বাঁচিয়ে দিতে
ভালবাসা-ই পারে!

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

নিপাতনে সিদ্ধ

আশি বছরের দাদু, দাঁতগুলো আস্ত
ডেকে বলে, শোন খোকা, আখ তুই খাস তো?
চিবুচ্ছি নাগাড়েই খান দুই বাকি তার
তুই শুধু দেখে যাবি, হতে পারে তা কি আর।
দেখে চোখ ছানাবড়া, সত্যি কি বৃদ্ধ
দাদু কন, ব্যাপারটা নিপাতনে সিদ্ধ।
জুতো-মোজা পরে আছি, এইবার ছুটব
হাওয়া নেব ফুসফুসে, রোদ্দুরও লুটব।
বাত নেই খাসা বেশ, অম্বলে নেই ভয়
বয়সের ভয়টা কি, চেষ্টায় কিনা হয়।
চালশে ধরেনি চোখে, শরীরটা বাধ্য
জল খাই এন্তার, পরিমিত খাদ্য।
দেখে চোখ ছানাবড়া ভারি একি বৃদ্ধ
দাদু কন, বোঝ তবে নিপাতনে সিদ্ধ।
এতদিন পড়েছিস সন্ধির মামলায়
চাক্ষুষ দেখে নিস, আমাকে কে সামলায়।

ছবি ঃ রীনা মণ্ডল

সমর পাল

যাচ্ছ কোথায়

যাচ্ছ কোথায়? যাচ্ছি কোথায়?
সেইখানে ঠিক যাচ্ছি আমি
যেথায় আমার ভাই-বোনেরা
ঘুমিয়ে আছে পেটের জ্বালায়
যাদের দেখে চমকে থামি!

ওদের স্বপ্ন ভালবাসায়
বিবেক থেকেই দিচ্ছি সাড়া
বলছি তোরা আয় ছুটে আয়
থাকবি পুজোয় আদুলে গায়!
মাকে ডেকেই বলছি, দাঁড়া।

দুখের কথা শুনেই মা কন
দুঃখ তোদের থাকবে না আর,
এখন থেকেই দুঃখ সবার
আমার বুকেই হবে পাহাড়।

সুনির্মল চক্রবর্তী

পোস্টাভিস-গুদামঘর

পোস্টাভিস-গুদামঘর,
আর কি লিখি অতঃপর?
পানের দোকান, হাট-বাজার,
মুকুটহীন সেই রাজার—
পালক সাঁটা মস্তকে,
তেল মাখাতে ব্যস্ত কে?

পোস্টাভিস-গুদামঘর,
গায়ে মাখে বৃষ্টিঝড়;
আর যে আছে পাঠশালা,
কিংবা একটা আটচালা—
বোবার মতো রাত্রিদিন,
একলা থাকে আপোসহীন।

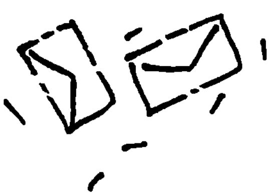

শিবাশিস্ দত্ত

পোষ্য ভূতের ছড়া

সন্ধ্যাবেলা ওন্দাগ্রামে কেউ যেও না ভুলে
ক্ষিরিশতলার শিরীষ গাছে
ভূত-ভূতানি ভাংড়া নাচে
স্যাঙ্গাতেরা দাপিয়ে বেড়ায় আকাশে, ঠ্যাং তুলে!

ভাবছ বুঝি গুল-গাপ্পা? করতে পার যাচাই
কিন্তু ভায়া খুব হুঁশিয়ার
মারলে ওরা কিল-ঘুষি আর
খিমচে কিম্বা কামড়ে দিলে কঠিন হবে বাঁচাই!

এসব খবর কোথায় পেলাম, শুনবে যদি বলি—
ওন্দাগ্রামের খুব কাছেতেই রামসাগরের গলি,
সেইখানে এক গোপন ঘরে
আমার মামা রিসার্চ করে
অদ্ভুত আর কিম্ভূত সব ভূত-ভূতনি নিয়ে
গতবছর দেখে এলাম নিজের চোখে গিয়ে!

ক্ষিরিশতলার শিরীষগাছের ভুতুড়ে কারখানায়
মামাই তো রোজ নিশুতরাতে হাইব্রিড ভূত বানায়,
ভূতগুলো বেশ পোষ মানে ভাই
বাড়ছে ওদের চাহিদা তাই
কিন্তু যত গোবেচারাই মরছে ওদের হানায়,
গোপন খবর—কয়েকটা ভূত পচছে নাকি থানায়!

অমিতাভ দাস

বাঘ যাবে বেন্দাবনে

সোঁদরবনের বাঘ বলল ডেকে,—
মোড়লমশাই সবই গেলাম রেখে;
শুনুন জনগণ—
সাধ করেছি ছেড়েছুড়ে যাবই বেন্দাবন

পরব তিলক, জপব মালা;
গাইব হরিনাম
পাপক্ষালনের পথ পেয়েছি
পুরবে মনষ্কাম

পেটের দায়ে খুন করেছি,—
অনুতাপে ভুল ধরেছি;
চির-বিদায় থাকবনা আর বনে।
সাধ করেছি থাকব বেন্দাবনে

অবাক চোখে মোড়ল করে
মালুম—
কী বিনয়ে বলছে কথা—
শুনছি বাঘের কথকতা,
কোথায় গেল হালুম!

ছবি ঃ রীনা মণ্ডল

জ্যোতির্ময় মল্লিক

জুতোর জন্যে

নতুন জুতো মচমচিয়ে
যাচ্ছে বাজার ভুতো,
হঠাৎ তারে খ্যাপা ষাঁড়ে
মারতে এল গুঁতো।

ভুতোবাবু তাইনা দেখে
পিছলে পড়ে গোময় মেখে
পালিয়ে এল বিরস মুখে
ফেলে সাধের জুতো।

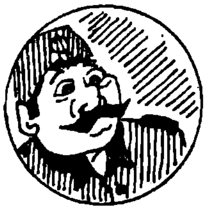

সুকান্ত দাশ

পটাই যখন পটকাল

ভজহরি গড়গড়ি পটলডাঙায় আসা ইস্তক পটাই ভারি আতান্তরে পড়েছে। দিন নেই রাত নেই, সময় নেই, অসময় নেই—লজঝড়ে মার্কা একখানা মোটরসাইকেল চেপে সারা গ্রাম জুড়ে রীতিমতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন নতুন দারোগা। তা এমন দাপুটে দারোগা এ-গাঁয়ের লোক কস্মিনকালেও দেখেনি। দারোগার মতো দারোগা বটে একখানা। যেমন দশাশই চেহারা, তেমনি তার গলার আওয়াজ। গলা শুনলে মনে হবে কেউ যেন বুকের মধ্যে হামানদিস্তে দিয়ে মশলা-পেষাই করছে। চোখে চোখ রাখতে গেলে রীতিমতো বুকের পাটা থাকা চাই। তা এমন একখানা জাঁদরেল দারোগা পেয়ে পটলডাঙার সব লোক তো একেবারে আহ্লাদে আটখানা। কেবল পটাই ছাড়া। কেননা গাঁয়ের লোকের পৌষ মাস মানে পটাইয়ের সাড়ে সর্বনাশ। পটাই অবিশ্যি এমন দারোগা জীবনে ঢের দেখেছে। তার ভয় হল দারোগা সাহেবের ওই কিম্ভূতমার্কা যন্ত্রটিকে। যন্ত্র তো নয়, যেন যন্ত্রণা। চলতে শুরু করলে ভটভট করে এমন বিদঘুটে আওয়াজ বেরোতে থাকে শুনলে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়ার জোগাড়। ভয়ানক ওই শব্দের গুঁতোয় তার রাতের কাজ, কারবার সব শিকেয়।

এই তো গেল মাসের কথা। অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকারে গাঁয়ের জোতদার পরাণ ঘোষের বাড়ি সিঁদ কেটে ঢুকে সে কী বিপত্তি! সবে পটাই বুড়োর বালিশের তলা থেকে চাবির গোছাখানা সরিয়ে সিন্দুক হড়কাতে যাবে, এমন সময় ওই গগনভেদী ভটভট শব্দ। ব্যস, তাতেই পরাণ বুড়োর পাকা ঘুমের দফারফা। নেহাত কপালের জোর আর ক্যাস্টর অয়েলের কেরামতি, তাই সেদিন পটাই বুড়োর হাত হড়কে জানলা গলে সটকাতে পেরেছিল। নইলে এতদিনে নির্ঘাত হাজতবাস। সঙ্গে উপরিপাওনা ছিল ভজহরি দারোগার ওই তেল চুকচুকে রুলের গোটা কয়েক আছোলা বাড়ি।

কিন্তু এমনি করেই-বা কদিন কাজকর্ম সব বন্ধ করে কাঁহাতক আর ঘরে বসে থাকা যায়। ঘরে বসে থাকতে-থাকতে এদিকে হাতে-পায়ে খিল ধরে যাওয়ার জোগাড়। সিঁদকাঠিগুলিতে পর্যন্ত মরচে ধরতে আরম্ভ করল। এ-যে একেবারে হাতে না-মেরে পেটে মারার সামিল। অথচ আগের দারোগা গগন পাকড়াশি, কী ভালোটাই না ছিলেন। একেবারে দেবতুল্য মানুষ। অমন দারোগা লাখে একটা মেলে কিনা সন্দেহ! সন্ধে হওয়ার একটু আগে মায়ের প্রসাদি চড়িয়ে সেই যে শয্যা নিতেন। উঠতেন পরদিন দুপুর গড়িয়ে গেলে। পটাইও বেশ নিশ্চিন্ত মনে রাতভোর কাজকর্ম সেরে রোজগারপাতির সিকিভাগটুকু তাঁর শ্রীচরণে রেখে আসত প্রণামী হিসেবে। তা ভজহরি দারোগার সঙ্গেও ওইরকমই একটা পাকা বন্দোবস্ত করতে একদিন থানায় গেল পটাই। দারোগাবাবুর ঘরে পা রাখতেই বাজখাঁই কণ্ঠে ভেসে এল,—কী চাই?

গলা শুনেই তো পটাইয়ের ধরণী দ্বিধা হও অবস্থা। বাপরে বাপ। গলা তো নয় যেন মেশিনগান দিয়ে গোলা ছুটছে। তবু সাহসে বুক বেঁধে বিগলিত কণ্ঠে বলেছিল,—আজ্ঞে স্যার, আমি পটাই।

—পটাই! কোন পটাই? তুমি কোন লাটসাহেবের বাঁট হে, যে নাম বললেই তোমাকে চিনতে পারব। ভজহরি দারোগা রীতিমতো তড়পিয়ে ওঠেন।

পটাই গলার স্বর আরও মিহি করে বলল,—আজ্ঞে স্যার, এ অধমের নাম শ্রীমান পটাকেষ্ট পাকড়াশি। পিতার নাম ঈশ্বর ফাটাকেষ্ট পাকড়াশি। তবে কী জানেন স্যার, কিঞ্চিত হাতযশের জন্য পাঁচ গাঁয়ের লোক আমাকে ওই পটাই নামেই চেনে। আপনি নতুন লোক তাই ঠিক আমাকে চিনতে পারছেন না। দু-চারদিন থাকুন। দেখবেন আমার এই নামখানি ঠিক আপনার কানে এসে পৌঁছাবে।

পটাইয়ের কথাগুলো ভজহরি দারোগার ঠিক বোধগম্য হয়না। খাবিখাওয়া-চোখে তিনি তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। পটাইও পড়ে যায় ফাঁপরে। এ-কেমন দারোগা, যে লাইনের কথা বোঝে না। যা থাকে কপালে, এইভেবে কপাল ঠুকে পেটের কথাটা শেষপর্যন্ত মুখেই বলে ফেলে পটাই।

মানে বলছিলুম কী স্যার, আপনার ওই মোটরসাইকেলটার কথা। ভারি বিদঘুটে আওয়াজ। যন্ত্রটার ওই শব্দের জন্য রাতের কাজেকম্মে বিস্তর ঝামেলা পুহাতে হচ্ছে স্যার। তাই বলছিলুম যদি যন্ত্রটাকে বিদায় করেন, তবে কাজের ভারি সুবিধে হতো আমার। তবে ভাববেন না স্যার, আপনার বখরা আপনি সময় মতোই পেয়ে যাবেন। রাতভোর যা গ্যাঁড়াতে পারব তার ফিফটি পারসেন্ট আপনার। মা কালির দিব্যি বলছি স্যার, এ-কথার নড়চড় হবে না।

পটাই যখন কথাগুলো বলছিল, ভজহরি দারোগার চোয়াল তখন ক্রমশ শক্ত হচ্ছিল। পটাই থামতেই তিনি তড়াক করে লাফ মেরে উঠলেন। তাঁর আধমণি শরীরখানা রাগে তখন থরথর করে কাঁপছে। মাথার চুলগুলো সব খাড়া। চোখদুটো জবাফুলের মতো টকটকে লাল। পিলে চমকানো গলায় তিনি বলে

উঠলেন,—তবে রে ব্যাটা চোরের পো! এত বড় স্পর্ধা তোর। দাঁড়া আজ তোরই একদিন কী আমার একদিন!

ভজহরি দারোগার ওই রণমূর্তি দেখে পটাই আর দাঁড়ায়! বিপদের গন্ধ পেয়ে তার আগেই সে তিনলাফে পগারপার।

বলা বাহুল্য ওই ঘটনার পর থেকে ভজহরি দারোগার টহলদারি গেল আরও বেড়ে। টহলদারির গুঁতোয় বেচারি পটাইয়ের তো 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। যেখানেই চুরি করতে যায় ওই শব্দ তাকে তাড়া করে ফেরে। পটাই বেশ বুঝতে পারে হয় তাকে এই পটলডাঙা ছাড়তে হবে, নতুবা ওই যন্ত্রটাকে বিদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। মনে-মনে মতলব ভাঁজতে থাকে পটাই। ভাবতে-ভাবতে হঠাৎই বিদ্যুতচমকের মতো তার মাথায় একখানা বুদ্ধি খেলে যায়। দি আইডিয়া! শব্দদূষণ। ওই শব্দদূষণের যাঁতাকলেই ভজহরি দারোগাকে কাত করতে হবে। পটলডাঙার সব থেকে দুঁদে উকিল রমাকান্ত ঢোলকে পাকড়াও করে পটাই। তার মতলব শুনে রমাকান্তবাবু তো রীতিমতো থ।

—বলিস কী রে পটাই? তোর পেটে পেটে এত! তাও কিনা আবার চোর হয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে নালিশ! এজন্যই বলে ঘোর কলি। সারা জীবনে ঢের কেস লড়েছি বাবা, কিন্তু এমন কেস...। না, না বাবা এ-আমার দ্বারা কিছুতেই...

রমাকান্তবাবুর কথা ফুরোবার আগেই তার নাকের ডগার সামনে কড়কড়ে দুখানা

একশ টাকার নোট মেলে ধরেছিল পটাই। নতুন নোটের গন্ধ পেয়ে আর বৃথা বাক্যব্যয় করেননি তিনি। পটাইয়ের মতলব মতো একখানা আরজিনামা লিখে দিয়েছিলেন। তার বয়ানটা ছিল এরকম—

"আমি শ্রীমান পটাকেষ্ট পাকড়াশি মহামান্য আদালতের নিকট এই মর্মে নালিশি জানাইতেছি যে, শ্রীযুক্ত ভজহরি গড়গড়ি মহাশয় সম্প্রতি আমাদের পটলডাঙা থানার দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। তবে এই অভিযোগনামা সরাসরি তাঁহার বিরুদ্ধে নহে। এই অভিযোগ তাঁহার ব্যবহৃত একখানি মোটরসাইকেলের বিরুদ্ধে। মোটরসাইকেলখানি অতীব মান্ধাতার আমলের বলিয়া অনুমান হয়। এবং ওই যন্ত্রখানির বিকট শব্দ শুনিলে পরাণবায়ু পালাইবার পথ খুঁজিতে থাকে।

মহামান্য আদালত নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, পঁয়ষট্টি ডেসিবেলের উর্ধ্বে সৃষ্ট শব্দ শুধু যে অবাঞ্ছিত তাহাই নহে, তাহা অপরাধও বটে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে আইনের রক্ষক হইয়াও গড়গড়ি মহাশয় নিজেই সেই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার গাড়ি হইতে সৃষ্ট শব্দ যে পঁয়ষট্টি ডেসিবেলের কতগুণ উর্ধ্বে তাহা মাপিবার যন্ত্র বোধকরি আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। গড়গড়ি মহাশয় এ-গাঁয়ে আসা ইস্তক কত লোক যে হৃদযন্ত্র বিকল হইয়া ইতিমধ্যে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন তাহারও কোনও ইয়ত্তা নাই।

মহামান্য আদালতের নিকট সুবিচারের আশায় তাই এই মর্মে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, এই অন্যায়-অবিচারের প্রতিকারের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে যথাবিহিত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।

মতলবখানা যে এত চমৎকার কাজ দেবে, সত্যি বলতে কী পটাই নিজেও তা এতখানি ভাবেনি। কোর্টে অভিযোগ দাখিল করবার দিনসাতেকের মধ্যেই পটলডাঙার হাটে-বাজারে, আকাশে-বাতাসে রটে গেল ভজহরি দারোগার বদলির খবর। কিন্তু এই বদলির পিছনের আসল রহস্যটি কাকপক্ষীতে টের পেল না। হাড়ে-হাড়ে মালুম পেল কেবল রমাকান্ত উকিল। কী কুক্ষণেই যে টাকার লোভে পড়ে কেসটা সেদিন হাতে নিয়েছিলেন। সেদিন পটাই তার বাড়ি থেকে চলে আসবার পর থেকেই বিয়েতে শ্বশুরমশাইয়ের দেওয়া তিন হাজার টাকা দামের দামি হাতঘড়িটা বেমালুম উধাও। হাতঘড়ির শোকে তিনি নাকি দুদিন অন্নজল গ্রহণ করেননি। সব কথাই পটাইয়ের কানে আসে। আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে কেবল মিচকি-মিচকি হাসে আর সিঁদকাঠিতে শান দিতে থাকে।

এইরকমই একদিন সকালবেলায় পটাইয়ের কানে খবর এল, থানায় নাকি জিনিসপত্র সব বাঁধাছাঁদার কাজ চলছে। তাই না-শুনে পটাই তো বেজায় খুশি। খুশিতে ডগমগ পটাই সেই সক্কালবেলাতেই একহাঁড়ি রসগোল্লা কিনে নিয়ে থানায় গেল ভজহরি দারোগাকে বিদায় জানাতে। আসল উদ্দেশ্য অবিশ্যি ভজহরি দারোগাকে একটু সমঝে দিয়ে আসা। থানায় পৌঁছাতে পটাই দেখতে পেল থানার হাবিলদার রামশরণ হাওলাদার সেই মোটরসাইকেলখানা ঝাড়পুঁছ করছে। আর ভজহরি দারোগা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তার তদারকি করছেন। পটাইকে দেখতে পেয়ে তিনি স-উল্লাসে বলে উঠলেন,—আয় পটাই আয়। এতক্ষণ তোর কথাই ভাবছিলুম রে। আমি জানতুম তুই ঠিক আসবি।

দারোগাবাবুর কথা শুনে পটাই ভ্যাবচ্যাকা মেরে যায়। সে ভেবেছিল তাকে দেখে দারোগাবাবু বুঝি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেন। কিন্তু এ-যে এখন উলটো-পুরাণ। মোটর সাইকেলের শোকে শেষমেষ ভজহরি দারোগার মাথাখানা খারাপ হয়ে গেল না তো। কিছুক্ষণ বাদেই অবশ্য ব্যাপারটা তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। ভজহরিবাবু বললেন,—অনেকদিন ধরেই ভাবছিলুম জিনিসটা বিক্রি করে দেব কিন্তু কিছুতেই মায়া কাটাতে পারছিলুম না। হাজার হোক বাপ-ঠাকুরদার আমলের জিনিস তো। তা তুই সে ব্যবস্থাখানা করে দিলি। তা একদিক দিয়ে ভালোই হল। পেট্রোলের খরচটাও বাঁচবে। আর এখন থেকে থানায় বসেই নজরদারি চালাতে পারব।

সে কী স্যার, আর আপনার বদলির অর্ডার! —আঁতকে ওঠে পটাই।

—বদলি! কার বদলি? তুই তো নালিশ ঠুকেছিলি আমার এই গাড়িখানার বিরুদ্ধে। এরই মধ্যে বেমালুম সব ভুলে মেরে দিলি। রমাকান্ত উকিল তো আমাকে সেরকম কথাই বলল। সে নিজে শহরে গিয়ে জজ সাহেবের সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থা পাকা করে এসেছে।

হাতঘড়ি সাফাইয়ের প্রতিশোধ নিতে রমাকান্ত উকিল যে ভিতরে-ভিতরে একটা জব্বর চাল চেলেছে পটাই তা বেশ বুঝতে পারে। তবুও সে মনে-মনে খুশি না-হয়ে পারে না। যাক বাবা! আপদ যন্ত্রটাকে তো অন্তত গ্রামছাড়া করা গেছে। এখন আর তাকে পায় কে? ওঃ কতদিন সিঁদকাঠি ধরা হয়না। হাতগুলো যেন নিশপিশ করছে।

পটাই এবার কেটে পড়বার তাল করতেই ভজহরি দারোগা বাজখাঁই কণ্ঠে হাঁক পাড়েন,—পটাই?

বাঘের গর্জন শুনে পটাই ভড়কে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

—তোর হাতে ওটা কী?

—আজ্ঞে স্যার রসগোল্লা। আপনার জন্যই নিয়ে এয়েছিলাম।

—তা ফেরত নিয়ে যাচ্ছিস যে বড়। ওটা রেখে যা। পটাই বিগলিত কণ্ঠে বলল,—আজ্ঞে স্যার তা আর বলতে। এতদিন পরে লাইনে এলেন তাহলে। তাই বলছিলুম কী স্যার আমার কথাটাও একটু ভেবে দেখবেন।

ভজহরি দারোগা একটু মিচকেপানা হেসে বললেন,—ভেবে তো রেখেছি রে হতভাগা। তুই আমার এতবড় উপকার করলি আর তার বদলে আমি তোর জন্য কিছু করব না, তাই কখনও হয়। ওই দ্যাখ।

এই বলে তিনি থানার বারান্দার একপাশে ঠেস দিয়ে রাখা একটা নতুন সাইকেলের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন।

পটাই চোখ ছানাবড়া করে সাইকেলটার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। কিন্তু ব্যাপারটা তার বোধগম্য হল না।

ভজহরিবাবু সেই মিচকেপানা হাসিটা আর-একটু চওড়া করে দিয়ে বললেন,—আজ থেকে প্রত্যেকদিন দুপুরে লোকের বাড়ি মুনিষ খাটবি। আর রাতেরবেলা আমাকে সাইকেলে চাপিয়ে গ্রামের টহলদারিতে বেরোবি। আমি সাইকেল চালাতে পারি না-কিনা তাই এই ব্যবস্থা। আর কোনওদিন যদি এর অন্যথা হয়েছে কী সোজা লক-আপে ঢুকিয়ে আড়ং-ধোলাই। কথাটা মনে থাকে যেন।

ভজহরি দারোগার কথা শুনে পটাইয়ের তো আক্কেল গুড়ম। মুখে আর রাটি কাটে না। শেষকালে তাকে দিয়ে কিনা টহলদারি! তাও আবার ওই আধমণি ওজনের শরীরটাকে সাইকেলে চাপিয়ে। এ-যে আর-এক বিপত্তি। এখন উপায়!

ছবি ঃ বিজন কর্মকার

বি নো দ ঘো ষা ল

বৃষ্টি দিন

ক্রি...রি...রি...রি..., এলার্ম ঘড়িটা বন্ধ করে বিছানা ছেড়ে চটপট উঠে পড়লেন মুকুলবাবু। তারপর চোখমুখ ধুয়ে, জামাকাপড় ছেড়ে মর্নিংওয়াকে বেরোবার ঠিক আগে হঠাৎ মনে পড়ল 'আজকেই তো?' টেবিলের ওপর রাখা চিঠিটাকে খুলে '...২২শে মে গণদেবতায় আসছি' কথাটাকে দেখেনিলেন তারপর ক্যালেন্ডার দেখে মিলিয়ে নিয়ে আরেকবার নিশ্চিন্ত হলেন উনি। হ্যাঁ আজকেই ২২শে মে। আজকেই ওরা আসছে। ওরা মানে মুকুলবাবুর ছেলে অনুপ, বউমা আর ওদের দুটি ছেলে-মেয়ে। আজ একটু তাড়াতাড়িই ফিরে আসতে হবে এই ভেবে মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে পড়লেন উনি। ভোরবেলার ঝিরঝিরে ঠান্ডা হাওয়া ওঁর খুশি-খুশি মনটাকে আরও খুশিতে ভরিয়ে তুলল। হাঁটতে-হাঁটতে উনি ভাবছিলেন গ্রামের হাওয়ায়-মাটিতে সত্যিই একটা মন ভোলানো জাদু আছে। না-হলে স্ত্রী মারা যাবার পর নিজের নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণ মনটাকে খানিক হালকা করার আশা নিয়ে বন্ধু-স্বজনদের পরামর্শে বাগবাজারের ৩৫ নং নিবেদিতা লেনের বাড়ি ছেড়ে সেই যে বেড়াতে এসেছিলেন বোলপুরে, তারপর আর কলকাতায় নিজের বসত বাড়িতে ফিরে যাননি। নিজের অনুভবী মনটা সত্যিই বাঁধা পড়ে গেছিল বোলপুরের লালমাটি, উঁচু-উঁচু তালগাছ, বটগাছ, বাঁশঝাড়, শালুক-শাপলা-কলমি ভরা পুকুর, ভাঙা রাজবাড়ি, মন্দির আর সবুজ মাঠের মধ্যে। প্রথমটায় এমন একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ায় খুবই আপত্তি জানিয়েছিল অনুপ আর বউমা। কারণ, প্রথমত ওরা দুজনেই কলকাতার অফিসে চাকরি করে, ফলে বাবার সঙ্গে বোলপুরে থাকা সম্ভব নয়, আর দ্বিতীয়ত এই বৃদ্ধ বয়সে একা-একা এমন অজ-পাড়াগাঁয়ে থাকবেন ওটা ছিল সত্যিই একটা দুশ্চিন্তার বিষয়, কিন্তু শত ওজর-আপত্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মুকুলবাবুই জয়ী হয়েছিলেন। অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজি করিয়েছিলেন ওদেরকে। তারপর বোলপুর স্টেশন থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার পশ্চিমে চন্দনপুর নামে একটা অখ্যাত গ্রামে ছোট্ট একটা মাটির বাড়ি বানিয়ে নতুন জীবন শুরু করেছিলেন একা।

তারপর দেখতে-দেখতে চোদ্দটা বছর কেটে গেছে এই গ্রামে। অনুপরা অনেকবার এসেছে ওঁর সাথে দেখা করতে। আজকেও

আসছে। তবে আজকে আসার কারণটা একটু অন্যরকম। বেশ কিছুদিন ধরেই চোখে অস্পষ্ট দেখছিলেন মুকুলবাবু। পুরনো চশমাটায় তেমন কাজ হচ্ছিল না। ডাক্তারকে দেখাতে ডাক্তার বললেন, চোখের পাওয়ার বেড়েছে। চশমা বদলাতে হবে। অনুপকে চিঠিতে একথা জানাতেই অনুপ চিঠি লিখে জানিয়েছে, ঢের হয়েছে গ্রামে থাকা, এবার ওনাকে ওদের সঙ্গে কলকাতায় থাকতেই হবে। খুবই স্বাভাবিক। মুকুলবাবুর বয়স এখন চুয়াত্তর। একা-একা থাকেন। কখন কী বিপদ-আপদ ঘটে যায় কিছু বলা যায়? তাই মনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবার আর 'না' বলে নিজের জিদ বজায় রাখতে পারেননি উনি। ওদের দুশ্চিন্তার কথা ভেবেই ওদের সাথে কলকাতায় ফিরে যাবেন ঠিক করেছেন। তবে বাগবাজারের সেই পুরনো বাড়িতে নয়, অনুপ ওই বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে পণ্ডিতিয়ায় নতুন ফ্ল্যাট কিনেছে, সেইখানে। একদিকে ছোট-ছোট নাতি-নাতনি দুটি, অনুপ আর বউমার সঙ্গলাভের আনন্দ, অন্যদিকে এই রাঙামাটির বিচ্ছেদের দুঃখ—এই দুই অবিমিশ্র অনুভূতিতে মুকুলবাবুর মনটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, ঠিক তখনি, 'বাবু ওনারা আজ আসতিছেন তো?' প্রশ্নে চটক ভাঙে ওঁর, সামনে কাসু দাঁড়িয়ে। মুকুলবাবুর কাজের লোক। পাশের বাগদি পাড়াটায় থাকে। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ আসছে',—বলে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালেন উনি,—'ওরেব্বাবা সাড়ে ছটা বেজে গেছে। চল-চল তাড়াতাড়ি চল' বলে তিনি কাসুর সাথে বাড়ির দিকে হাঁটা লাগালেন। 'শোন, তুই আগে বাজারটা করে চটপট রান্নাটা সেরে ফেলবি, তারপর এগারোটা নাগাদ বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াবি, বুঝলি।' চলতে-চলতেই কী-কী রান্না করতে হবে সব বুঝিয়ে দেন মুকুলবাবু। তারপর বাড়ি ফিরে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা। উফ! সময় যেন কাটতেই চায় না। কতদিন নাতি-নাতনি দুটোকে...।

দুই

পুরো তিন-তিনটে দিন যে কীভাবে কেটে গেল টেরই পেলেন না মুকুলবাবু। ছেলে, বউমা, বিশেষ করে ফুলের মতো সুন্দর বাচ্চা দুটির সাথে গল্পে-হাসি-ঠাট্টায় মাটির ছোট্ট বাড়িটা যেন উৎসবের মণ্ডপ হয়ে উঠল। নাতিটি বড়, ডাকনাম পাপু, ভালো নাম রূপ। ক্লাস ফোরে পড়ে। আর নাতনির ডাক নাম পিংকি, ভালো নাম কথা। ও পড়ে ক্লাস টু-তে। মুকুলবাবুর অবশ্য ওদের ভালোনাম দুটিই বেশি পছন্দের। তাই ওদের রূপ আর কথা বলেই ডাকেন। প্রতিদিন ভোরবেলায় তিনি ওদের দুজনকে নিয়ে বেড়াতে বেরোন। নতুন-নতুন গাছ-পাখি চিনিয়ে দেন। ওদের অকারণ ছুটোছুটি, খিলখিল-হাসিতে মুকুলবাবুর মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। তিনি ভাবেন শহরের কৃত্তিম-যান্ত্রিক পরিবেশ ছেলেমেয়ে দুটির মনটাকে স্পর্শ করতে পারেনি তাহলে।

সবই ঠিক ছিল, কিন্তু সব আনন্দ ধুয়ে দিল শুধু একটা বৃষ্টি। কলকাতা ফেরার ঠিক আগের দিন বিকেলে। অনুপ আর নীরা, মানে ওর স্ত্রী দুজনে মিলে গেছিল পাশের গ্রাম রজতপুরের চৈতন্যদেবের মন্দির দেখতে। পাপু আর পিংকি দাদুর সাথে বেড়াতে যাবে বলে ওরা আর যায়নি। সেদিন দুপুর থেকেই আকাশের মুখটা ছিল গোমড়া। তারপর অনুপ আর নীরা বেরিয়ে যাওয়ার খানিক বাদেই আকাশ ভেঙে নামল বৃষ্টি। উফ! কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! সেইসঙ্গে পাগলা-হাওয়া। আর হবে নাই-বা কেন, জ্যৈষ্ঠমাস না-আসতেই যা গরম পড়েগেছিল কদিন ধরে। মুকুলবাবু বারান্দায় বসে নাতি-নাতনি দুটিকে নিয়ে বৃষ্টি দেখছিলেন। বাড়ির সামনেটায় মাঠে মাটির উঁচু-উঁচু সবুজ টিপিগুলো থেকে নদীর মতো এঁকেবেঁকে জলের ধারা নামছে। দূরে ধূসর মাথাওয়ালা লম্বা গাছগুলো হাওয়ার তালে-তালে দুলছে। সে-এক দৃশ্য বটে! ছেলেমেয়ে দুটো প্রথম থেকেই কেন জানি উশখুশ করছিল। তারপর দুজনেই একছুটে নেমে পড়ল উঠোনে। দুহাত তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভিজতে লাগল ওরা। মুকুলবাবু বারণ করতে গিয়েও করলেন না। থাক ভিজুক। শহরে তো আর এমন বৃষ্টি পায় না। নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল ওঁর। বৃষ্টি আসলে উনিও এইভাবে বাড়ি থেকে একছুটে বেরিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতেন। কোনও বারণ শুনতেন না। কেউ জিগ্যেস করলে উত্তর দিতেন,—'ভিজতে ইচ্ছে করছে তাই ভিজছি।' নিজের ছেলেবেলার সেই উত্তরটা আবার একবার শোনবার লোভ নিয়ে তিনি স্নেহভরা গলায় জিগ্যেস করলেন ওদের 'কিগো রূপকথা, এমন বৃষ্টিতে ভিজছ কেন?' রূপ উত্তর দিল, 'বৃষ্টিতে ভিজলে ঘামাচি মরে দাদু, তাইজন্য ভিজছি।'

'কী!' —একটা সজোরে চাবুকের আঘাত পড়ল যেন মুকুলবাবুর মনে। ব্যথায় বিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন তিনি শহরের কনভেন্টে পড়া দুটি শৈশবহীন শিশুর দিকে। তারপর আলতোভাবে ওদের থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে উনি দেখলেন সামনের সবুজ মাঠ ভিজছে, গাছ ভিজছে। পুরনো ভাঙা মন্দির ভিজছে, অদূরে দাঁড়ানো গরুগুলো ভিজছে, রাখাল ভিজছে। খড়ের চালে বৃষ্টি পড়ার একটা নরম-মিষ্টি শব্দ। কোনও কারণ নয়, উদ্দেশ্য নয়, শুধু ভেজার জন্যই ভিজছে। তারপর আরও কী যেন ভাবনায় ডুবে গেলেন উনি।

তিন

আজ যাবার দিন। সকালবেলা অনুপ ঘুম থেকে উঠে দেখল বাবা ঘরে নেই। ও ভাবল গ্রামে পরিচিতদের সাথে দেখা করে ফিরবেন বোধহয়। কিন্তু অনেকটা বেলা গড়িয়ে যাওয়ার পর এবার সত্যিই ভাবনায় পড়ল ওরা। কী হল? এত দেরি হওয়ার তো কথা নয়। বাবাকে খোঁজবার জন্য কাসুকে পাঠাল অনুপ। কিন্তু অনেকক্ষণ পর কাসু শুকনো-মুখে ফিরে এসে উত্তর দিয়েছে, 'পেলুমনি তো।' যাবার জন্য সবাই তৈরি। ট্রেনের সময়ও হয়ে এসেছে। অথচ...। এমন সময় নীরা একটা কাগজ এনে অনুপের কাছে এসে বলল,—'হ্যাঁ গো দেখো, বাবার বিছানার ওপর এটা রাখা ছিল।' অনুপ ওর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে দেখল একটা চিঠি। বাবার হাতের লেখা। আরে এ তো অনুপকেই লেখা! অনুপ পড়তে থাকল,—

স্নেহের অনুপ,

জানি আমার এমন আচরণে তোমরা সকলে মনে খুব দুঃখ পাবে। কিন্তু আমার যে এছাড়া আর কোনও অন্যপথ ছিল না। তোমার মা মারা যাওয়ার পর এই গ্রাম আমাকে যা দিয়েছে সে ঋণ শোধবার নয়। কোনওদিনই পারব না। শহরের জটিল যান্ত্রিকতার নিঃসঙ্গ জীবন থেকে আমি মুক্তি পেয়েছিলাম এখানে এসে। তাই আবার শেষমুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলাম কোথাও যাব না। জীবনের শেষ কটাদিন এখানেই কাটাতে চাই। আমার চোখের জন্য দুশ্চিন্তা কোরো না। ও এমন কিছু নয়। যে কদিন আছি আর নতুন করে দৃষ্টি বদলাতে চাই না। পুরনো চোখেই পৃথিবীটাকে দেখতে চাই। তোমরা যেন ভেবো না যে তোমাদের কোনও আচরণে আমি ক্ষুণ্ণ হয়েছি। তোমাদের কোনও দোষ নেই। বরং দোষ আমারই। সেই অকারণ পুরনো জিদ। তোমাদের যাওয়ার সময় সামনে থাকলাম না এই কারণেই যে এই কথাগুলো হয়তো মুখে বলতে পারতাম না। আমার জন্য চিন্তা কোরো না। তুমি ও বউমা আমার আশীর্বাদ নিও। রূপ আর কথাকে মানুষ কোরো।

ইতি তোমার বাবা।

ছবি : প্রবীরকুমার সামন্ত

সি দ্ধা র্থ মু খো পা ধ্যা য়

গল্প লেখার গল্প

গল্প প্রতিযোগিতার গল্পটাকে লেখার জন্যে, রাতের খাওয়া সেরে অয়ন চুপিচুপি ঢুকে পড়ল ছোটদাদুর ঘরে। মারা যাওয়ার পর থেকে ঘরটা খালিই পড়ে থাকে। নামকরা উকিল ছিলেন বলে ঘরটাও বেশ পরিপাটি করে সাজানো। একদিকে সুদৃশ্য চেয়ার-টেবিলের সারি, র‍্যাক ভর্তি চামড়া বাঁধাই ওকালতির বই। সাতজন কৃতী মহাপুরুষের অয়েল পেন্টিং দেওয়ালের ওপরের দিকে শোভা পাচ্ছে। বাড়ির লোকে এঁদের নাম দিয়েছিল সপ্তরথী।

মহাপুরুষদের প্রতিকৃতিতে প্রণাম করে লেখাটা সবে শুরু করেছে, ঝপ করে লোডশেডিং হয়ে গেল। অন্ধকারে বসে থাকতে-থাকতে হঠাৎ কেমন গা ছমছম করে উঠল অয়নের। একটা নীলাভ আলোয় ঘরটা ভরে উঠেছে। সেই আলোয় আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে, সাতটি মূর্তি ঘরের চেয়ারগুলিতে উপবিষ্ট। নীল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে ওই মূর্তিগুলোর শরীর থেকেই।

ভয়ে মাথার চুল দাঁড়িয়ে উঠেছে অয়নের। একটি মূর্তি বলে উঠল,—ভয় পেও না। দেওয়ালে যাদের প্রতিকৃতি টাঙানো, আমরা হচ্ছি সেই সপ্তরথীর দল। আমি

বিদ্যাসাগর। আমার ডানদিকে রয়েছেন বঙ্কিম, মাইকেল আর রবীন্দ্রনাথ। বাঁদিকে বসে আছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ঋষি অরবিন্দ আর নেতাজী সুভাষ। তা বাপু, এই উকিলদাদুটির ঘরে কস্মিনকালেও তো তোমাকে পায়ের ধুলো পর্যন্ত দিতে দেখিনি। হঠাৎ এই মধ্যরাত্রে এখানে ঢুকে, আমাদের এত ঘটা করে প্রণাম কী জন্যে?

বিনীতভাবে অয়ন তার গল্প লেখার উদ্যোগের ব্যাপারটা জানাল। বিদ্যাসাগর শুনে বললেন,—খুবই সাধু উদ্যোগ। তা গল্পের বিষয়বস্তুটি কী বাপু?

অয়ন বলল,—আজ্ঞে, গল্প লেখার গল্প—এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কাহিনীটাকে লিখতে হবে।

বিদ্যাসাগর বললেন,—গল্প আখ্যান, গল্প মঞ্জরী নাম না-হয়, কাহিনীর নামকরণ হবে গল্প লেখার গল্প? সে আবার কী ধরনের কাহিনী? মাইকেল কিছু বুঝলে?

মাইকেল বললেন,—না মাইডিয়ার ডিড, গল্প জিনিসটা আমার আসে না।

অয়নের দিকে ফিরে মাইকেল বললেন,—হোয়াই ডোন্ট ইউ রাইট সাম লিরিকস্। আমার অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেই লেখো।

অয়ন বলল,—লিরিকস-কবিতা চলবে না স্যার। গল্পই লিখতে হবে। গল্পের বিষয়বস্তুও পত্রিকার সম্পাদকমশাই ঠিক করে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ বললেন,—আমি বুঝেছি ব্যাপারটা। গল্প লেখার গল্প—এই বিষয়বস্তুর ওপর বোধহয় একটা গল্প প্রতিযোগিতা হচ্ছে। ভারতী, প্রবাসী, শনিবারের চিঠির মতো আগের অনেক পত্রিকাও এ-ধরনের গল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করত। সফল প্রতিযোগীরা মোটা টাকার পুরস্কার পেত। পুরস্কারপ্রাপ্ত কাহিনীগুলি প্রকাশিত হলে, এইসব লেখকরা সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতিমান হবার সুযোগ পেত।

বঙ্কিমচন্দ্র রাগতস্বরে অয়নকে বললেন,—পুরস্কারের লোভে সাহিত্য সাধনা? সরস্বতীর উপাসনায় নিয়োজিত হয়ে অর্থের অন্বেষণ! ধিক তোমাকে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বললেন,—এইজন্যেই বাঙালির কিছু হল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কাগজে কলমে ধস্তাধস্তি করে ক-পয়সা পাবে? সেই সময়টা বাদাম-ফেরি করলে ঢের বেশি রোজগার হতো।

সুভাষচন্দ্র বললেন,—গল্প লিখতে তো বসেছ। নিজের দেশটার কথা কিছু ভাব! স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও চারদিকে এই যে অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, অনাহার, তা থেকে পরিত্রাণের রাস্তা দেশবাসীকে দেখাবার কথা কিছু ভাব?

দিশাহারা অয়ন বলল,—এসব নিয়ে আমরা ভেবে কী করব স্যার! আমাদের নির্বাচিত নেতারা আছেন। তাঁরাই যা ভালো বোঝেন করেন।

সুভাষচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন,—নেতারা দেশটাকে যদি গোল্লায় নিয়ে যায়, তোমরা যুবসমাজ চোখবুজে দেখে যাবে?

অয়ন বলল,—আমার একার পক্ষে কিই-বা করা সম্ভব স্যার!

ঋষি অরবিন্দ শান্ত, গম্ভীর-স্বরে বললেন,—মনে রেখো, এক থেকেই অনেক। শুভ কাজে সারা পৃথিবীকে তোমার সঙ্গে পাবে।

অয়ন বলল,—দেশ আর ঠিক রাস্তায় চলছে না স্যার। আপনাদের মতো মহারথীদের মহাপ্রয়াণ হবার পর থেকেই, দেশটা অধঃপাতেই চলেছে। মিথ্যা বলে, প্রবঞ্চনা করে, যেন-তেন-প্রকারণে টু-পাইস ইনকাম করে। আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়াটাই এখন আমাদের একমাত্র দেশকর্ম। এখন আমরা স্যার নিজেদের কথাই ভাবি। পাশের লোকটি মরে গেলেও কেউ ফিরেও তাকাই না।

বিদ্যাসাগর বললেন,—এই তো তোমার বোধোদয় হয়েছে। লেখনীর মাধ্যমে এগুলোকে তুলে ধরে, দেশের লোকের মধ্যে কেন চেতনা আনছ না?

অয়নের নিরাশ চোখমুখ দেখে রবীন্দ্রনাথ বললেন,—এ-ধরনের লেখার মধ্য দিয়েও তুমি একজন জন স্টুয়ার্ট মিল বা টমাস কার্লাইল হয়ে উঠতে পার। খ্যাতি, অর্থ, যশ—সব কিছুই তোমার এখন করায়ত্ত হবে।

মাইকেল বললেন,—তুমি এখনই একটা লেখা শুরু করো। আমরা অপেক্ষা করছি। প্রয়োজন হলে লেখাটাকে ঘষেমেজে দেব।

গল্প প্রতিযোগিতার জন্যে গল্প লেখার আশা ছেড়ে, সমাজ উদ্ধারকারী প্রবন্ধ রচনায় ব্রতী হল অয়ন। কদিন আগের ট্রেনের মধ্যেকার একটা ঘটনা নিয়েই লেখাটা শুরু করল। অসুস্থ দাদুকে নিয়ে, হাসপাতালে চলেছিল বছর পনেরোর এক কিশোর। শিয়ালদা স্টেশনে নেমেই অসুস্থ বৃদ্ধটিকে হঠাৎ মৃত্যু এসে গ্রাস করে। মৃত দাদুর শরীর নিয়ে, জনারণ্য শিয়ালদা স্টেশনে বসে রইল অসহায় কিশোরটি। কেউই তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল না।

লোকের এই আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতাকে নিয়ে, বেশ কড়া একটা প্রবন্ধ দাঁড় করাল অয়ন। লেখাটা শোনার পর বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করলেন, লিখেছ তো ভালোই। কিন্তু যে-ঘটনা তুমি প্রত্যক্ষ করোনি, তা নিয়ে কিছু লিখতে যাওয়া কি অর্বাচীনের কাজ নয়?

অয়ন উত্তেজিত হয়ে বলল,—কী বলছেন স্যার! ট্রেনের কামরায় সেই কিশোর আর তার অসুস্থ দাদুটির পাশেই যে আমি ছিলাম। শিয়ালদা স্টেশনে বৃদ্ধটিকে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে আমি নিজের চোখে দেখেছি।

বিদ্যাসাগর বললেন,—বটে! তা অসহায় কিশোরটিকে ফেলে, আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরের দল যখন পালাল, তুমি কী করছিলে বাছা?

অয়ন মিনমিন করে বলল,—আমার স্যার কলেজের তাড়া ছিল।

মাইকেল মধুসূদন বললেন,—স্ট্রেঞ্জ! এই পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে তুমি সমাজ উদ্ধারকারী প্রবন্ধ লিখবে!

রবীন্দ্রনাথ বললেন,—এ তো ঘোর অমানবিক আচরণ করেছ!

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন,—ওহে সুভাষ, এ ছোঁড়ার মধ্যে চেতনার ছিটেফোঁটাও নেই। এ লিখতে বসেছে চেতনা উদ্বুদ্ধ করার প্রবন্ধ। সবাই মিলে ওর কানদুটো মুলে দাও। ছোঁড়ার একটু শিক্ষে হোক।

বলে নিজেই অয়নের কানদুটো কষে মুলতে শুরু করলেন।

যন্ত্রণায় কাতরে উঠে অয়ন বলল,—উহুহু করেন কী স্যার, করেন কী স্যার! লাগছে যে।

সপ্তরথী উধাও হয়ে গিয়ে, বাবার খাঁকার গলা কানে ভেসে এল অয়নের।

—লাগবে না? লাগার জন্যেই তো টানছি। এ-ঘরে ঢুকে ঘুম লাগিয়েছিস কী জন্যে? তোর ঘুমনোর জায়গা নেই! লাগছে স্যার, লাগছে স্যার বলে চেল্লাচ্ছিসই-বা কেন? আমি কি তোর ইস্কুলের মাস্টার?

সম্বিত পেয়ে অয়ন দেখল, গল্প লিখতে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিদঘুটে সব স্বপ্ন তার থেকেই।'

সপ্তরথীর ছবির দিকে চোখ যেতে, অয়নের কিন্তু মনে হল, যা দেখল সত্যিই কি তা স্বপ্ন!

ছবি ঃ প্রবীরকুমাব সামন্ত

গরুর জন্য গান

ধীরলয়ের সুরেলা গান গবাদি পশুদের প্রথম পছন্দ। এক্ষেত্রে গানেতে খুশি হয়ে তারা নিজেদের উৎপাদনকেও বেশ বাড়িয়ে তোলে। ব্রিটেনের লেইস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই গবেষক ডঃ অ্যাড্রিয়ান নর্থ এবং লায়েম ম্যাকেঙ্গি দীর্ঘ গবেষণার মধ্য দিয়ে একথা সম্প্রতি প্রমাণ করলেন। তাঁরা একহাজারের বেশি হলস্টাইন ফার্সিয়ান গরুর উপর ধীরলয়ের গানের প্রভাব নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করে দেখেছেন, মৃদু সংগীত শোনালে গরুর দুধ উৎপাদন ক্ষমতা কম করে তিন শতাংশ বেড়ে যায়। সারাদিনে মাত্র ছয় ঘণ্টা গান শোনানোই যথেষ্ট। তবে গান-বাজনার গতি কখনওই যেন মিনিটে একশ বিটকে না-ছাড়ায়। কেননা এর বেশি গানের গমক পশুদের মনের অস্থিরতাকে বাড়িয়ে তুলবে।

ব্রিটেনে বহু পশু-খামারি চটজলদি খামারে বসিয়ে ফেলেছেন নামি-দামি মিউজিক সিস্টেম। প্রতিদিনই নিয়ম করে বাজানো হচ্ছে রেম, সিমন ও রিডের সব বিখ্যাত ক্ল্যাসিকাল গান। আমাদের দেশে রেম-রিড না-মিললেও কে এল সাইগল, জগজিৎ সিং-এর গানকে এ-বিষয়ে অনায়াসে ব্যবহার করা যেতে পারে।

তস্য হালকা এরোজেল

বিশ্বের সবচাইতে হালকা কঠিন বস্তুটি কী? উত্তরটা খুব সহজে যে আসবে না, তাও হলফ করেই বলা যায়। কারণ সম্প্রতিই এটিকে আবিষ্কার করা গেছে।

নাসার ক্যালিফোর্ণিয়ার জেট প্রোপালসান ল্যাবরেটরির এক প্রবীণ গবেষক ডঃ স্টিভেন জোনস্ এই বস্তুটির জন্ম দিয়েছেন। এর নাম এরোজেল। কাচের মতোই এটিকে সিলিকন-ডাই-অক্সাইড ও সিলিকা (বালি) দিয়ে তৈরি করলে কী হবে, এই এরোজেল কাচের তুলনায় হাজারগুণ বেশি স্বচ্ছ। এর প্রধান কারণ, এরোজেলের মোট আয়তনের ৯৯.৮ শতাংশ বাতাস-ভরা। দেখতে ঘনীভূত নীল ধোয়ার মতো এই পদার্থের প্রতি সি.সি.-র ওজন মাত্র ৩ মিলিগ্রাম। অত্যন্ত হালকা এই এরোজেলকে মূলত মহাকাশ গবেষণার কাজে ব্যবহার করতে চায় নাসা। মহাকাশযানে কুপরিবাহী হিসেবে এরোজেলকে ব্যবহারের পাশাপাশি একে যানের গায়ে লাগিয়ে মহাকাশের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহের কাজেও লাগানো যাবে বলে আবিষ্কারক ডঃ জোনস্ জানিয়েছেন।

দাঁতে বসছে মোবাইল

মোবাইল ফোন এখন আকছার ব্যবহার করা হচ্ছে। যখন-তখন এদিক-ওদিক চলে যাওয়া ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে এই ফোনের জুড়ি নেই। কিন্তু এই ফোন ব্যবহারেও কিছু সমস্যা রয়েছে। যেমন ধরো, তুমি সাঁতার কাটছ কিংবা দুহাত দিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ করছ, তখন ফোন বাজলে কী করবে? এই জাতীয় কিছু সমস্যা মিটিয়ে মোবাইল প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করতে এগিয়ে এলেন লন্ডনের দুই বিজ্ঞানী জেমস্ অগার ও জিমি লিজিই, তাঁরা আমেরিকার ম্যাসাচ্যুসেটস্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি বা এম আই টি—কারিগরি সহায়তায় আবিষ্কার করেছেন ছোট্ট একটা মোবাইল যন্ত্র। এই যন্ত্রকে কিনে কিন্তু তোমাকে যেতে হবে দন্তচিকিৎসকের কাছে। তিনি খুদে মোবাইলকে মাড়ির যে কোনও একটা দাঁতের মধ্যে ফুটো করে বসিয়ে দেবেন। ব্যস, এইটুকুই। এরপর থেকে যতই ব্যস্ততা থাকুক শব্দবার্তাকে শুনতে এতটুকুও আর অসুবিধা হবে না। আবিষ্কারক বিজ্ঞানীদের মতে সাধারণ মানুষ এই ফোন ব্যবহার না-করলেও নিরাপত্তা কর্মীদের ক্ষেত্রে এটি খুব কার্যকরি। এখানে অবশ্য কিছু কুপ্রয়োগের সম্ভাবনাও থেকে যাচ্ছে। এই অপপ্রয়োগের তালিকায় শীর্ষে থাকছে খেলোয়াড়রা। সঠিক সময়ে কিছু মারাত্মক সিদ্ধান্তকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে তো কথাই নেই। সে যাই হোক না- কেন, জিমি-জেমস্-এর এই খোঁজ দারুণ আশা জাগিয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। এমনকি ইতিমধ্যেই খুদে মোবাইল গ্যাজেটটি লন্ডনের রয়াল কলেজ অব আর্টের গ্যালারিতে স্থান করে নিয়েছে।

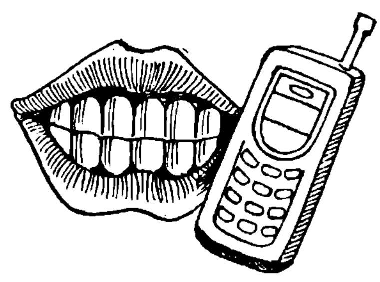

অপরাজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটকু
আর
সুপার কম্পিউটার
সুদীপ্ত মণ্ডল
ছোটকুর জন্মদিনে একটা বড় পার্সেল এসেছে। কিন্তু কোত্থেকে কিভাবে এল তা কেউ বুঝে উঠতে পারল না। পরবর্তী সময়ে যে কি চমক অপেক্ষা করছে তা ছোটকু নিজেও জানত না।
খুলেই দেখা যাক, ভিতরে কী আছে!
আরিব্বাস! বাবা এর ভেতর কম্পিউটার রয়েছে। এই দেখো...
বাঃ বেশ-বেশ। কিন্তু ওদিকে কার পোষা লালমাছ মরেছে বলে রেল অবরোধ করেছে রে। অথচ আজ তোর কম্পিউটার পরীক্ষা।
আমি এখন যাচ্ছি। অবরোধ উঠলে এসে খবর দেব। তুই নতুন উপহারটা নিয়েই থাক।
ইস্‌স। কী দারুণ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। খুবই সমস্যা...
বিপ বিপ!! এটা আমার কাছে কোনও সমস্যাই নয় স্যার। অনুগ্রহ করে মেশিনে বসুন।
ইর্‌ক! কে কথা বলে র‍্যা?
আমার নাম সুপার কম্পিউটার। যে কোনও সমস্যার সমাধান করার প্রোগ্রাম আমার মধ্যে করা আছে। দয়া করে আমার স্ক্রিনে চোখ রাখুন।
এবার আপনি সরাসরি রেল অবরোধ দেখতে পাবেন।
স্বপ্ন দেখছি কিনা কে জানে!
ও স্ক্রিনে যা দেখল...
যেমন শিখিয়েছি তেমন করে লড়ে যা ওঁচা। তোর লালমাছ মরার জন্য কর্তৃপক্ষকে জবাব দিতেই হবে। রেল রোকো জিন্দাবাদ।
এসব বন্ধ করো ছোকরা।
কেন?
চাই
গোল্ডফিস মরল কেন? জবাব চাই, জবাব দাও।

হেঃ-হেঃ! ওঁচার মাছের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। আসলে আমি চাইছি ছোট্কু আর টিচার যাতে আজ পরীক্ষার দিনে স্কুলে পৌঁছতে না পারে।
এই ব্যাপার! ওঁচার শুভবুদ্ধি হওয়া দরকার।
বেশ কথা। 'এন্টার' বোতামটি টিপুন স্যার।
সুপার কম্পিউটার কাজ করে ০ সেকেন্ডের মধ্যে।
!
অ্যারেঃ! আমি এখানে কী করছি রে? ওদিকে স্কুলের হোমটাস্কগুলো একদম করা হয়নি তো! আমার এখনই বাড়ি ফেরা উচিত!
স্কুলের পড়া করে নিলে আমি আরেকটা গোল্ডফিস কেনার পয়সা পাব।
এ্যাই হতভাগা! সরে পড়ছিস যে বড়?
আঁই পুলিশ!
রোসো! রেলরোকোর সাধ জন্মের মতো ঘুচিয়ে দিচ্ছি হতচ্ছাড়া।
উঃ! আঃ! আঃ উফ্স্!
পরীক্ষা দিতে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নে ছোটকু। তাজ্জব ব্যাপার হয়েছে! এরই মধ্যে রেল অবরোধ উঠে গেছে!
ও, তাই বুঝি!

শেষ

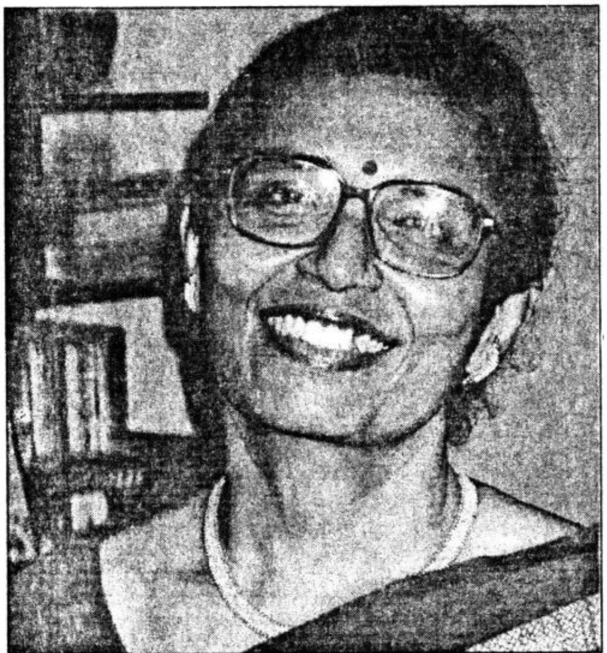

তোমাদের প্রায় সকলেরই মনে নানান প্রশ্ন জাগে, নানান সমস্যায় হঠাৎ-হঠাৎ দিশেহারা লাগে নিজেকে। এ যে বড় অস্থির সময়। কাকে বলি মনের কথা? কার সঙ্গে আলোচনা করে শান্তি পাই? তোমরা তোমাদের সমস্যার কথা লিখে জানাও। তোমাদের সমস্যা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে কলম ধরেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনোবিদ

ড. নী লা ঞ্জ না সা ন্যা ল

মনের কথা কই

আমাদের জীবন অনেকগুলো বেলা ধরে এগোয়... ছোট, মেজ, সেজ, বড়... ইত্যাদি, অর্থাৎ শৈশব, কৈশোর, যৌবন

আমার বয়েস ১৪, ক্লাস এইট-এ পড়ি। আমার চার বছরের ছোট এক বোনও আছে। আমাদের দুজনকে মা বড্ড আগলে-আগলে রাখেন। কোথাও একা-একা ছাড়েন না। কাছাকাছি দোকানেও যেতে দেন না। স্কুল থেকে মাঝেমধ্যে এক্সকারশনে নিয়ে যায়। আমায় যেতে দেন না। বোন না-হয় ছোট আছে, কিন্তু আমি তো বড় হয়ে গেছি। খালি না-না আর না। এরকম করলে কী করি বলুন তো?

এষা চট্টোপাধ্যায় প্র্যাট মেমোরিয়াল স্কুল

আমাদের জীবন অনেকগুলো বেলা ধরে এগোয়...ছোট, মেজ, সেজ, বড়...ইত্যাদি, অর্থাৎ শৈশব, কৈশোর, যৌবন—প্রাপ্তবয়স্কের স্তরের মধ্যে দিয়ে। আমরা যখন ছোটবেলায় থাকি, তখন বড়বেলা কী সঠিক বুঝতেই পারি না, তাই শিশুবয়েসে নিজের খেলাতেই মত্ত হয়ে দিন কেটে যায়। কিন্তু একটু বড় হলে, পৃথিবীর অন্য অনেক বিষয় সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান হলেই আমাদের আরও জানতে ইচ্ছে করে, বুঝতে ইচ্ছে করে, জীবনকে 'আমার মনের' মতো করে চিনতে ইচ্ছে করে। আমরা মনের তাগিদেই বড় হতে চাই। আর এই তাগিদ প্রতিফলিত হয় 'স্বাধীন হওয়ার' ইচ্ছের মাধ্যমে। তোমার এখন জীবনের এই বেলাটার বয়স। বোঝ অনেক কিছু, কিন্তু না-বোঝা বিষয়ও অনেক-অনেক আছে। তাই যেটা যেভাবে বুঝলে কষ্ট হয়না, মনে ক্ষোভ জন্মায় না, তা বোঝার ভুলে মন অভিমানে অন্ধকার হয়ে যায়।

তুমি জানাচ্ছ মা তোমাদের আগলে রাখেন বলে তোমার ভালো লাগে না। কোনও সচেতন জীবকেই শেকল পরিয়ে রাখলে, তার ভালো লাগতে পারে না, তাই তোমারও বিষয়টা ভালো লাগে না। আসছি, তোমার এই ইচ্ছের প্রসঙ্গে। তার আগে একটা কথা বলি, ভেবে দেখেছ তোমার মা তোমাদের কিরকম ভালোবাসেন, তোমাদের ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকতেই পারেন না। কত শিশু সমাজে, সংসারে থাকে যারা মাতৃস্নেহ থেকে কতরকম কারণে বঞ্চিত। তাদের মা তাদের আগলেও রাখেন না। আবার স্নেহের ছোঁয়ায় ভরিয়েও দিতে পারেন না। তোমার সেইরকম কোনও বন্ধু জানা থাকলে, তাকে জিগ্যেস করে দেখো তো তার মনের অবস্থা কী? আসলে রোজ-রোজ আমরা যা পাই, তার গভীর মূল্য আমাদের কাছে অনেকসময় অস্পষ্ট হয়ে থাকে তাই, পাওয়ার বিষয়টা সম্পর্কেই আমাদের অভিযোগ জমে ওঠে। কত সময় মায়ের রান্না ভালো হয়নি বলে আমরা রাগ করি। মাকে ছেড়ে অনেকদিন থাকতে হলে অনেক সময়েই মায়ের সেই রান্নাই আমাদের বড্ড খেতে ইচ্ছে করে। মায়ের ভালোবাসা, স্নেহের বন্ধনে তোমার যে কষ্ট হচ্ছে, তাকে অন্যদিক থেকে দেখো, খারাপ লাগার বদলে, মাকে তুমি বোধহয় আরও ভালোবাসবে।

মায়ের প্রসঙ্গে তোমায় দুটো কথা বলি। মনের দিক থেকে তোমার মা কিন্তু একটু বেশি নরম, অর্থাৎ তাঁর জোর কম। মেয়ে বড় হচ্ছে, তা সত্ত্বেও উনি তোমার উপর আস্থা রেখে ছাড়তে যখন পারেন না, সেটা ওঁর অক্ষমতা। কিন্তু কোনও মানুষ কমজোরি হলে তার উপর বিরক্ত হলে চলে না যে, বুঝতে হয় ওটা উনি পারেন না। তাই মাকে বিরক্তি দেখিও না। নিজের কাজগুলো আরও মন দিয়ে করে অনেক বেশি সাফল্যমণ্ডিত হও, দেখবে মা তোমাকে আগলে রাখতে চাইলেও, বাইরের পৃথিবী তোমায় চিনতে পেরে কাছে টেনে নিচ্ছে। সবাই তোমার কাজের প্রশংসা করলে, সেটাই হবে তোমার মায়ের মনের জোর, তোমার উপর আস্থা বাড়ানোর একমাত্র ওষুধ, আর দুটো বছর অপেক্ষা করো, স্বাধীন রাস্তায় চলার সুযোগ অফুরন্তভাবে ছড়ানো, যদি তুমি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে চলতে পারো। এটুকু সময় না-হয় মায়ের আদরে একটু মুখ বুজে রইলেই।

আমি কিশোর ভারতীর এক নিয়মিত পাঠক। আমার বয়েস ১৩ বছর। আমি পড়াশোনার সঙ্গে অবসর সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পড়ে থাকি। মার বক্তব্য হল যে, পত্রিকা পড়লে নাকি আমি পড়াশোনায় মন দেব না। আমার তখন খুব মন খারাপ লাগে। কী করব—জানাবেন।

তুহিন কুমার দে শিবপুর, হাওড়া

তোমার মায়ের ধারণার সাথে আমি একেবারেই একমত নই। বাইরের পত্র-পত্রিকা, বই পড়লে জীবনকে চেনার, বোঝার অনেক ইঙ্গিত অনেক তাড়াতাড়ি বুঝতে পারা যায়। জ্ঞান যত বাড়ে তাতে বুদ্ধির বিকাশ শুধু নয়, মনের প্রশস্ততা বাড়ে। সকলের সাথে মিলে- মিশে থাকার মতো মন তৈরি হয়, আচরণে সামঞ্জস্য রেখে চলার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রশ্ন তাহলে, তোমার মা কি এগুলো কিছু বোঝেন না? আমার কিন্তু তা মনে হয়না। ব্যাপারটা কিরকম জানো, আজকাল পৃথিবীটা এত বেশি প্রতিযোগী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে, আমরা সব ছোটদের ভবিষ্যৎ নিয়েই বড্ড উৎকণ্ঠায় ভুগি। কী হবে ওর ভবিষ্যৎ...ঠিকমতো দাঁড়াতে পারবে তো জীবনে? তোমাকে নিয়ে তোমার মায়েরও এরকম ভয়-ভাবনা আছে। তাই পড়ার বই-এর বাইরে অন্য বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করে সময় ব্যয় করলে, উনি ভাবেন তোমার পড়ার ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই সম্ভবত বিষয়টা পছন্দ করেন না। এর একটা যুক্তিও আছে। পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষা দিতে হয়, তার তুলনায় পত্র-পত্রিকার বিষয়গুলো আমাদের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয়, তাদের বিশেষ যত্ন সহকারে মনে রেখে পরীক্ষাও দিতে হয়না বলে, সেগুলো পড়তে আমাদের বেশি ভালো লাগে। মন তো হালকা থাকতেই বেশি ভালোবাসে, তাই পড়ার বাইরে এগুলো সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ অনেক বেশি। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে নিজের কাজ না-করে এগুলোতে সময় বেশি কাটালে, এটাও সৎ-অভ্যাস বলা যাবে না। তাছাড়া এর টান যদি পড়া থেকে তোমার মনকে টেনে ধরে রাখে, তাহলে প্রয়োজনীয় বিষয়ে মনোযোগ কমে যাবে আর তাতে তোমার ক্ষতিই হবে। তাই নিজের মনকে প্রশ্ন করো, সব কাজ ঠিক সময়ে করে, এগুলো কি তুমি শুধু বিনোদন হিসেবে নাও, নাকি বিনোদনেই তোমার মন ডুবে থাকতে চায়? যদি মনে হয় নিজের কাজে অবহেলা তুমি করো না, তাহলে নির্দ্বিধায় তুমি পত্র-পত্রিকা পড়তে পারো, এক্ষেত্রে মা রাগ করলে, তাঁকে বুঝিয়ে বলা দরকার আর তাঁর সামনে তোমার পড়াশোনার 'ভালো ফল' প্রমাণের স্বাক্ষর স্বরূপ রাখা দরকার। ভদ্র ব্যবহার তার সঙ্গে দরকার। যা, তোমার ব্যক্তিত্বের মিষ্টি গন্ধ নিয়ে মায়ের মনকেও একসময় ভরিয়ে তুলবে।

আমি একাদশ শ্রেণীতে পড়ি। কবিতা লিখি। কল্পনা করতে বা ভাবতে ভালোবাসি। শুধু মনে হয় পাহাড়-জঙ্গল-আকাশের দেশে হারিয়ে যাই। এই অতিরিক্ত কল্পনাবিলাসী হওয়ায় আমার পড়াশোনায় মাঝে-মাঝে ক্ষতি হয়ে যায়। তখন মা-বাবা বেশ বকাবকি করেন। রাগও হয় নিজের ওপর। আমার সমস্যার সমাধান জানাবেন।

তন্ময় ব্যানার্জী, চুঁচুড়া

খুব আবেগ প্রবণ ব্যক্তিত্ব তোমার। সুস্থ জীবন বিকাশে বুদ্ধি আর আবেগের সংমিশ্রণ প্রয়োজন, এর কোনও একটা অনেকটা বেশি আর বাকিটা খুব কম হলে মনের স্বাস্থ্যে সমতা থাকে না, আচরণে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়, ব্যক্তিগত জীবনের কার্যকারিতায় টানা-পোড়েন আসে। যেসব তোমার হচ্ছে। পাহাড়-জঙ্গল-আকাশের নরম নীল, সবুজের ছোঁয়া আমাদের মনে আরাম-তৃপ্তির ভাব আনবে, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু জঙ্গলের বুনো গন্ধে শুকনো পাতার উপর শুয়ে থাকলে বা মেঘের বালিশে মাথা গুঁজে নরম ছোঁয়ায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখলে যে পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, অঙ্কের দুরূহ বিষয় সমাধান করতে শেখার আনন্দকে চেনা যাবে না। সেগুলোর প্রয়োজন যে বেঁচে থাকার জন্যে, বাঁচার আনন্দ অনুভব করার জন্যে। আমি জানি তুমি এগুলো বোঝ। কিন্তু বোঝ বুদ্ধি দিয়ে, আবেগ দিয়ে নয়। আবেগ দিয়ে বুঝতে শেখা মানে পৃথিবীর যে কোনও বিষয় বা বস্তু যা, তাকে ঠিক তার প্রকৃতি অনুসারে বোঝা। এইরকম বুঝতে পারার ক্ষমতা পরিণত-মনস্কতার চিহ্ন। একটু ভেবে দেখো, মা-বাবা রেগে যান তুমি ভাববিলাসিতায় ডুবে থাকো বলে, আর তার ফলে কাজের কাজটা তুমি করে উঠতে পারছ না-বলে ভবিষ্যতে নিজেই সমস্যায় পড়বে! মা-বাবার স্নেহভরা মন চায় তুমি সুস্থ জীবনের দিশা খুঁজে পাও। তাই তোমায় সুস্থভাবে বাঁচতে শেখানোর জন্যে তাঁরা সচেষ্ট। ওঁদের ভুল বুঝো না। এটা থেকে তোমার পক্ষে বেরিয়ে আসা সম্ভব। সমাধান বলছি, মিলিয়ে দেখো তো একটু সুরাহা হয় কিনা!

নিজের ভাববিলাসিতা ছাড়ার প্রয়োজন নেই, শুধু সময়ের গণ্ডিতে একটু মেপেজুকে তাকে জুড়ে নাও। কীভাবে? যখন এত আবেশের ভাব নিজেকে জড়িয়ে ধরতে চায়, তখন নিজেকেই নিজে বলো, 'আসছি তোমাদের ভালো লাগায়, ভালোবাসায়, আগে একটু কাজটা সেরে নিই'। পড়াটা সেরে ফেলো আগে, তারপর কিছুটা সময় রাখো এই চিন্তা-কল্পনার জন্যে। পড়া সেরে এই চিন্তা-কল্পনায় এলে আরও ভালো লাগবে, কারণ কাজ ফেলে রাখার অপরাধবোধটুকুও মনের শক্তিকে শুষবে না সেখানে। নিজের এত আবেগ সামলানোর জন্যে ভোরবেলা সামান্য হালকা ব্যায়াম করতে পারো। খেলাধুলো বা গান-বাজনার জন্যে সামান্য সময় ব্যয় করতে পারলেও মন আরেকটু জুড়োবে। নেহাতই এসব করা না-গেলে মাঝে-মাঝে বড়দের মাঝে বসে দৈনন্দিন জীবন বা খবর নিয়ে একটু আলোচনা করে দেখতে পারো। দেখবে আবেগের আবেশের বাইরে কার্যকরি চিন্তায় মন অভ্যস্ত হলে, তার থেকেও আলাদা ধরণের ভালো লাগা আসে। এলিয়ে পড়া শরীর-মনের অভ্যেস থেকে নিজেকে টেনে বার করে কাজের উচ্ছ্বলতায় কিছুটা সময় রাখো। তৃপ্তি আসবে। ক্লান্ত হলে না-হয় আকাশের রঙ মেখে, জঙ্গলের রাস্তায় বা সমুদ্রের নোনা-জলে কিছুক্ষণ দাপিয়ে বেড়িও। কী মনে হয়, সব মিলিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করতে আরেকটু বেশি ভালো লাগবে না?

আজকাল পৃথিবীটা এত বেশি প্রতিযোগী মনো-ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে, আমরা সব ছোটদের ভবিষ্যৎ নিয়েই বড্ড উৎকণ্ঠায় ভুগি। কী হবে ওর ভবিষ্যৎ...

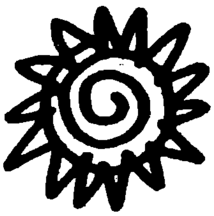

শুধু মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক যোগ্যতাতেই করে নেওয়া যায় অনেক দরকারি কোর্স ও ট্রেনিং। যা শিখে ভবিষ্যতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে খুব একটা সমস্যা হয়না। কিন্তু আমরা সকলেই সবটা জানি না। তাই এ-সম্পর্কে এই সংখ্যায় পরামর্শ দিচ্ছেন

রমাপদ পাহাড়ি

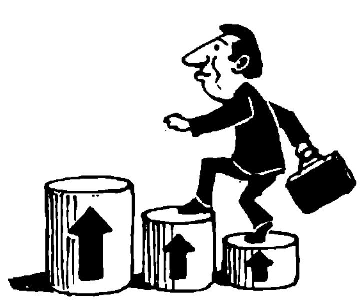

রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ

কোন্ বিষয়ে কেমন প্রশিক্ষণ

বিভিন্ন যোগ্যতায় আবাসিক ও অনাবাসিক যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষাগত যোগ্যতায়

অনাবাসিক

১. বুক বাইন্ডিং। মেয়াদ ২ মাস। খরচ ১০০ টাকা।

২. টেলারিং/গারমেন্ট মেকিং। মেয়াদ ৬ মাস। খরচ ৩০০ টাকা।

পঞ্চম শ্রেণী যোগ্যতায়

অনাবাসিক

১. মোটর ড্রাইভিং। মেয়াদ ৩ মাস। খরচ ১ হাজার ৫০০ টাকা। কোর্সটি কেবল পুরুষদের জন্য।

২. সফটটয়েজ তৈরি। মেয়াদ ৩ মাস। খরচ ১০০ টাকা। কোর্সটি কেবল মহিলাদের জন্য।

অষ্টম শ্রেণী যোগ্যতায়

আবাসিক প্রশিক্ষণ সূচি

১. প্লাম্বিং অ্যান্ড স্যানিটারি ফিটিংস। বয়স ১৮-২৫ বছর। মেয়াদ ১০ মাস। খরচ ১ হাজার টাকা।

২. উডক্র্যাফটস অ্যান্ড ফার্নিচার মেকিং। বয়স ১৮-২৪ বছর। মেয়াদ ১ বছর। খরচ ৫০০ টাকা।

৩. কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ। বয়স ১৮-২৫ বছর। মেয়াদ ১০০ দিন। খরচ ১ হাজার টাকা।

৪. মৎস্য চাষ। বয়স ১৮-২৫। মেয়াদ ৩০ দিন, খরচ ৭০০ টাকা।

৫. দুই বা তিন চাকার গাড়ি সংরক্ষণ ও মেরামতি। বয়স ১৮-২৫ বছর। মেয়াদ ১৮০ দিন। খরচ ১ হাজার ৪০০ টাকা।

অনাবাসিক

৬. আর্মেচার ও মোটর ওয়াইন্ডিং। মেয়াদ ৬ মাস। খরচ ৭০০ টাকা। কোর্সটি কেবল পুরুষদের জন্য।

৭. শাড়ি প্রিন্টিং (বাটিক, স্ক্রিন, ফেব্রিক)। মেয়াদ ৬ মাস। খরচ ৬০০ টাকা।

৮. ইলেকট্রিক ওয়্যারম্যানশিপ, মেয়াদ ৬ মাস। খরচ ৬০০ টাকা। কোর্সটি পুরুষদের জন্য।

৯. গ্যাস ও ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং। মেয়াদ ৬ মাস। খরচ ৮০০ টাকা। কোর্সটি কেবল পুরুষদের।

১০. মেসিন উল নিটিং। মেয়াদ ৬ মাস, খরচ ৪০০ টাকা। কোর্সটি কেবল মহিলাদের।

১১. ফোটো ল্যামিনেশন। মেয়াদ ৩ মাস। খরচ ৬০০ টাকা।

১২. মিড-ওয়াইফ কাম হোম-নার্সিং, মেয়াদ ৯ মাস, খরচ ৪০০ টাকা। কোর্সটি কেবল মহিলাদের।

১৩. ওয়াচ রিপেয়ারিং। মেয়াদ ৬ মাস। খরচ ৬০০ টাকা। কোর্সটি পুরুষদের জন্য।

মাধ্যমিক যোগ্যতায়

আবাসিক

১. রেডিও-টিভি (সাদা-কালো ও রঙিন) রিপেয়ার ও মেন্টেন্যান্স। বয়স ১৮-২৫ বছর। খরচ ১ হাজার ৮০০ টাকা।

২. ইলেকট্রিশিয়ান ও মোটর ওয়েল্ডিং। মেয়াদ ১ বছর। খরচ ১ হাজার ৫০০ টাকা।

৩. ফোটোগ্রাফি ও ডার্করুম প্রসেসিং (সাদা-কালো ও রঙিন)। বয়স ১৮-২৫ বছর। মেয়াদ ৬ মাস। খরচ ৪ হাজার টাকা।

৪. কৃষিকাজ। বয়স ১৮-২৫। মেয়াদ ১০০ দিন। খরচ ১ হাজার ২০০ টাকা।

৫. মুরগি পালন ও গো খামার পরিচালনা। বয়স ১৮-২৫ বছর। মেয়াদ ৩০ দিন খরচ ৭০০ টাকা।

অনাবাসিক

৭. বিউটি কালচার অ্যান্ড হেলথ কেয়ার। মেয়াদ ৬ মাস। খরচ ৭০০ টাকা। কোর্সটি কেবল মহিলাদের জন্য।

৮. কমার্শিয়াল আর্ট। মেয়াদ ৬ মাস। খরচ ৭০০ টাকা।

৯. সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং। অঙ্কনে দক্ষতা থাকা চাই। মেয়াদ ৬ মাস খরচ ৭০০ টাকা।

১০. মোটর মেকানিজম। মেয়াদ ১২ মাস। খরচ ১ হাজার ৫০০ টাকা। কোর্সটি কেবল পুরুষদের জন্য।

১১. রেফ্রিজারেশন এবং এয়ার কন্ডিশনিং। মেয়াদ ৬ মাস। খরচ ১ হাজার টাকা। কোর্সটি কেবল পুরুষদের।

১২. রেডিও টিভি (সাদা-কালো ও রঙিন) রিপেয়ারিং। মেয়াদ ১২ মাস। খরচ ১ হাজার ৫০০ টাকা। কোর্সটি কেবল পুরুষদের জন্য।

১৩. স্পোকেন ইংলিশ। মেয়াদ ৬ মাস। খরচ ৪০০ টাকা।

উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায়

আবাসিক

১. ইলেকট্রনিক্স ইকুইপমেন্টস অ্যান্ড ডিজিটাল। বয়স ১৮-২৫ বছর। মেয়াদ ১৮০ দিন। খরচ ১ হাজার ৮০০ টাকা।

অনাবাসিক

১. কম্পিউটার হার্ডওয়্যার। মেয়াদ ১২ মাস। খরচ ২ হাজার ৫০০ টাকা।

২. ফিজিওথেরাপি অ্যাসিস্ট্যান্ট। মেয়াদ ১২ মাস। খরচ ২ হাজার ৫০০ টাকা।

৩. টেলি অপারেটর কাম রিসেপসনিস্ট। মেয়াদ ৬ মাস। খরচ ১ হাজার টাকা।

বি কম যোগ্যতায়

আবাসিক

১. বুক কিপিং ও অ্যাকাউন্টেন্সি। বয়স ২০-৩০ বছর। খরচ ১ হাজার টাকা।

অন্যান্য তথ্যাদি

আবাসিকদের জন্য থাকা-খাওয়ার আংশিক খরচ বাবদ মাসিক ৫০০ টাকা দিতে হবে। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া আবাসিক প্রশিক্ষণ মূলত পুরুষদের জন্য। ডাকযোগে আবেদনপত্র পরিষদ থেকে পাওয়া যাবে না। বিশদ তথ্যের জন্য সরাসরি যোগাযোগ করাই বাঞ্ছনীয়। যে-কোনও সময় প্রশিক্ষণের বিষয়, মেয়াদ ও খরচা পরিবর্তিত হতে পারে।

যোগাযোগ

রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ,
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, কলি ১০৩।
ফোন ঃ ৪৭৭ ২২০৭।

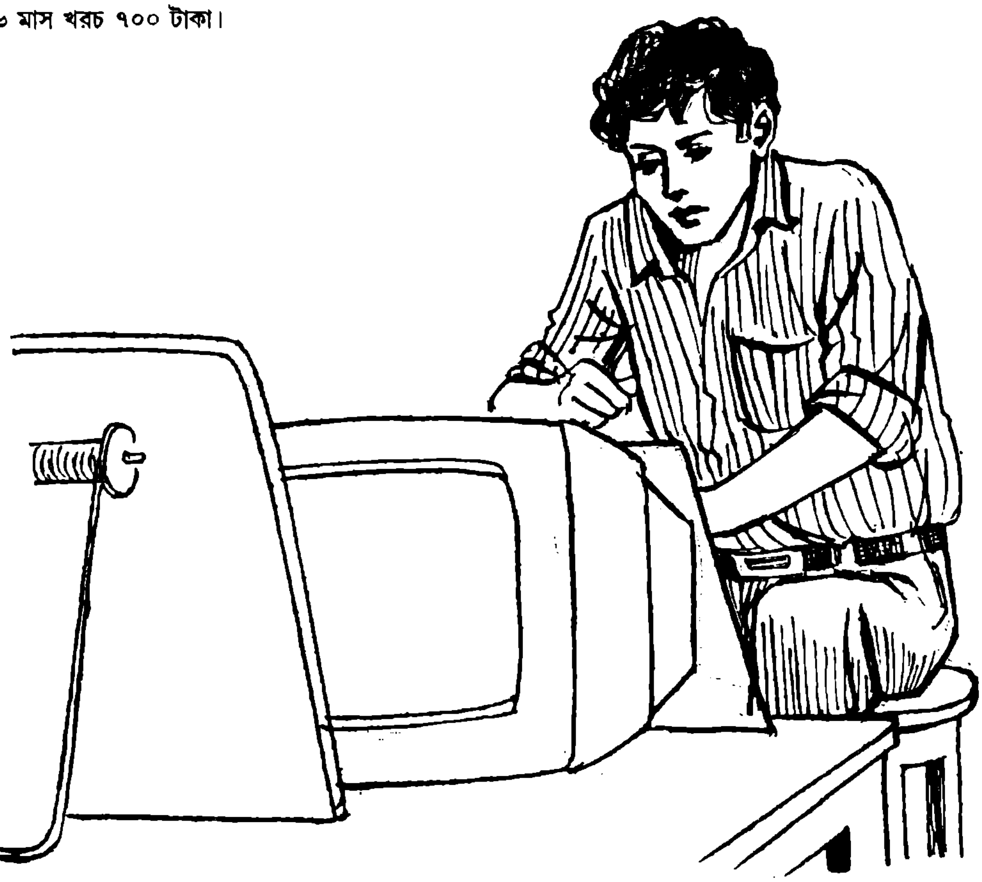

তোমাদের দপ্তর

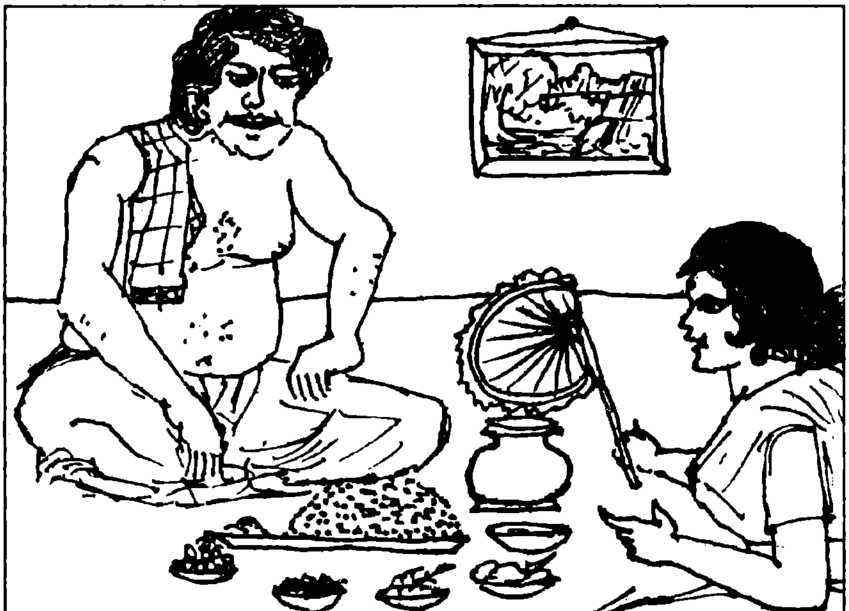

সুচেতনা বিশ্বাস, *৪র্থ শ্রেণী*
ডেভিড হেয়ার প্রাইমারি স্কুল, দুর্গাপুর ৫।

শরতের ছবি

বর্ষা শেষে, আসে শরৎ
হাসিমুখ নিয়ে।
নদীর দু-তীর ভরে ওঠে
শুভ্র কাশ দিয়ে।
ভ্রমরেরা ঘুরে বেড়ায়
ফুলের থেকে ফুলে,
মিষ্টি মধু খুঁজে বেড়ায়
ডানার পাল তুলে।
নদীর বুকে নৌকা ভাসে
মাঝিরা গায় গান।
ভাটিয়ালি সুরে-সুরে
মিষ্টি মধুর তান।
নীল আকাশের কোনে-কোনে
সাদা মেঘের ভেলা।
তারই মাঝে চলতে থাকে
মেঘ-রোদ্দুর খেলা।

জ্যোতির্ময় দাস
যোগেন্দ্রনগর
আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

সিকিম ঘুরে এলাম

এবার মে মাসে প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। কলকাতায় এবার নাকি ২২ বছর পর গরম পড়েছিল ৪৩.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গরম থেকে একটু স্বস্তি পেতে এবার তাই আমরা, অর্থাৎ বাবা-মা ও আমি গ্যাংটক ও পেলিং-এর দিকে বেড়াতে যাব ঠিক করলাম। ২৬শে মে রওনা হয়ে ২৭ তারিখ সকালে আমরা শিলিগুড়ি পৌঁছলাম। সেখান থেকে জিপে করে পৌঁছলাম গ্যাংটক। সেখানে আমরা উঠলাম হোটেল পোটালাতে। সেদিন সন্ধ্যায় আমরা শহরটা একটু ঘুরে দেখলাম। পাহাড়ের উপর ছবির মতো সুন্দর শহরটা। পরের দিন জিপ ভাড়া করে আমরা গেলাম ছাংগু লেক ও নাথুলা বর্ডার দেখতে। আমাদের সঙ্গে সেদিন চক্রবর্তী কাকুদের পরিচয় হল। তাঁরাও আমাদের হোটেলে উঠেছিলেন। কাকু, কাকিমা, তাতাইদাদা ও পাঁচ বছরের আকাশ আর আমরা—প্রায় ৫ ঘণ্টা জিপে করে চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আমরা ছাংগু লেকে পৌঁছলাম। সেখানে আমরা অনেক ছবি তুললাম। সবার মতো চমরি-গরুর পিঠে চড়ে আমিও একটা ছবি তুললাম। এরপর জিপে করে আমরা পৌঁছলাম বাবা হরভজন সিং-এর মন্দিরে। এখানে প্রবল ঠান্ডা এবং চারদিকে পাহাড়ের চূড়ায়-চূড়ায় শুধুই বরফ।

বাবা হরভজন সিং ছিলেন একজন সামরিক অফিসার। ১৯৬৮ সালে এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। সেখানকার সামরিক বাহিনীর লোকজন বহু খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর মৃতদেহ পায়নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, ওইখানকার সামরিক বাহিনীর লোকেরা বিশ্বাস করেন যে তিনি নাকি এখনও ভারতীয় সীমান্ত পাহারা দেন। চীন-ভারত সীমান্তে প্রবল তুষারপাতের মধ্যেও তিনি তাঁর কর্তব্য করে যান এবং সহকর্মীদেরও সতর্ক করে দেন। যাই হোক, সেদিন মিলিটারিকাকুরা সব ট্যুরিস্টদের দুপুরে লুচি- হালুয়া-আলুচানা-চা ইত্যাদি খেতে দিলেন। প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার ওঁরা এইভাবে ভ্রমণকারীদের খাওয়ান। খাবার পর আমি তাদের সাথে ছবি তুললাম। মিলিটারিকাকুরা সবাই খুব ভালো। আমার তাদের খুব ভালো লাগল।

পরদিন, অর্থাৎ ২৯শে মে খুব সকালে জিপে করে আমরা ও চক্রবর্তীকাকুরা রওনা দিলাম পেলিং-এর উদ্দেশ্যে। গ্যাংটক ভ্রমণ হল নির্বিঘ্নে। পেলিংও বড় সুন্দর এক শৈলশহর। পেলিং-এ আমরা দেখলাম ঝুলন্ত সেতু, যা এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম সেতু, ঝরনা, উপত্যকা, শান্ত-গম্ভীর বৌদ্ধ মন্দির ও নানা রঙের প্রচুর ফুল। সেখানে আমরা দুইদিন থাকলাম। ৩১শে মে আমরা আবার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

অর্ঘ চৌধুরী *সপ্তম শ্রেণী*
মদনপুর বালক বিদ্যালয়, নদীয়া

প্রসন্ন গুরুমশাই

বাংলা ভাষার পাঠশালা

বাংলায় অনুস্বার (ং) আর ঙ-র উচ্চারণ একই রকম। লেখার সময় অনুস্বারের সঙ্গে কোনও কার চিহ্ন (আ-কার, ই-কার এসব) দেওয়া যায় না, তখন ঙ-র দরকার পড়ে। যেমন, বাংলা কিন্তু বাঙালি, রং কিন্তু রঙিন। এছাড়া, বিভক্তি যোগেও অনুস্বারের জায়গায় ঙ-কে আনতে হয় ঃ রং + এর = রঙের, দার্জিলিং + এ = দার্জিলিঙে।

আবার সন্ধিতে কোনও-কোনও ক্ষেত্রে ম্-র জন্যে ঙ্ কিংবা অনুস্বার লেখারও বিধান আছে। শম্ + কর = শঙ্কর/শংকর, সম্ + গীত = সঙ্গীত/সংগীত।

অনুস্বার-ওয়ালা অতৎসম শব্দের কয়েকটি হল ঃ জং টং ঠ্যাং ঢং ব্যাং রং শিং সং আড়ং খ্যাংরা টেংরি ফড়িং ব্যাংক ভড়ং লংকা মিটিং।

অনুস্বার দিতে হবে এমন কিছু তৎসম শব্দের তালিকা—এবং কিংবা বরং সংখ্যা সংক্রান্ত সংক্ষেপ সংক্ষিপ্ত সংখ্যক সংগ্রহ সংগ্রাম স্বয়ং ইদানীং সুতরাং এবংবিধ কিংবদন্তি প্রিয়ংবদা বশংবদ বারংবার সংকীর্তন সংগঠন সংঘটন সংবরণ সংবর্ধনা সংবর্ধিত সংবলিত সাংঘাতিক স্বয়ংবর অবিসংবাদী কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

এবার অনুস্বার দিয়ে যে-সব শব্দ লিখছি সেগুলি বিকল্পে ঙ্ দিয়েও লেখা চলতে পারে (উদাহরণ সংঘ/সঙ্ঘ)। ওংকার কিংকর কিংকিণি পুংগব ঝংকার টংকার শংকর সংকট সংকর সংকল্প সংকীর্ণ সংকুল সংকেত সংগত সংগতি সংগম সংগীত সংঘর্ষ সংঘাত সংবাদ হুংকার অলংকার অহংকার তীর্থংকর দীপংকর ভয়ংকর শুভংকর সংকলক সংকলন সংকুচিত সংকোচন সাংকেতিক হৃদয়ংগম ধনুষ্টংকার প্রলয়ংকর।

এতক্ষণ অনুস্বার নিয়ে কথা হল। এখন সেইসব শব্দের কথা বলা যাক্,যাদের বানান ঙ দিয়ে লেখা চাই। সে-রকম শব্দের নমুনা ঃ চোঙা ঠোঙা ঠ্যাঙা ভাঙা ডিঙি ডোঙা ঢ্যাঙা ভাঙা ভেঙে রাঙা শিঙা সিঙি আঙিনা আঙুর আঙুল কাঙাল কাঙালি গোঙানি গোঙানো ঘুঙুর চাঙড় চাঙড়া টাঙানো ঠ্যাঙানো ডাঙশ ধাঙড় নোঙর বাঙালি ভাঙন ভাঙানি রঙিন লাঙল শিঙাড়া হাঙর ভাঙচুর ভাঙাগড়া।

ঙ্ দিয়ে তৈরি শব্দের তালিকাও প্রস্তুত করা যেতে পারে। প্রথমে ঙ্ক-যুক্ত শব্দ ঃ

অঙ্ক ডঙ্কা পঙ্ক শঙ্কা শঙ্কু অঙ্কন অঙ্কুর আতঙ্ক আশঙ্কা কঙ্কণ কঙ্কর কঙ্কাল কলঙ্ক দিনাঙ্ক পঙ্কিল পদাঙ্ক পালঙ্ক পৃষ্ঠাঙ্ক বঙ্কিম শঙ্কিত শ্রীলঙ্কা স্থানাঙ্ক হিমাঙ্ক চিত্রাঙ্কন জলাতঙ্ক মানসাঙ্ক মুদ্রাঙ্কন মুদ্রাঙ্কিত রেখাঙ্কন রেখাঙ্কিত স্ফুটনাঙ্ক।

ঙ্খ দিয়ে শব্দ ঃ শঙ্খ শৃঙ্খল শৃঙ্খলা অনুপুঙ্খ উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা শঙ্খচিল শঙ্খচূড় পুঙ্খানুপুঙ্খ ময়ূরপঙ্খি।

ঙ্গ দিয়ে বানান হয় এমন শব্দ অনেকগুলি পাওয়া যায়। যেমন, অঙ্গ গঙ্গা জঙ্গি তুঙ্গা দাঙ্গা ধিঙ্গি পঙ্গু বঙ্গ ভঙ্গ ভঙ্গি রঙ্গ লিঙ্গ লুঙ্গি শৃঙ্গ শৃঙ্গী সঙ্গ সঙ্গী সঙ্গে সাঙ্গ অজ্ঞান অঙ্গনা অঙ্গার অঙ্গুরি অঙ্গুলি ইঙ্গিত উচ্চাঙ্গ উলঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ গাঙ্গেয় জঙ্গম জঙ্গল তরঙ্গ নিঃসঙ্গ পিঙ্গল পূর্ণাঙ্গ প্রসঙ্গ প্রাঙ্গণ প্রত্যঙ্গ ফিরিঙ্গি বঙ্গাব্দ বঙ্গীয় বিহঙ্গ ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি ভঙ্গিল ভঙ্গুর মঙ্গল মৃদঙ্গ লবঙ্গ শৃঙ্গার শ্বেতাঙ্গ সর্বাঙ্গ সুড়ঙ্গ স্ফুলিঙ্গ হাঙ্গামা অঙ্গভঙ্গি অঙ্গীকার অঙ্গীভূত অনুষঙ্গ অর্ধাঙ্গিনি আলিঙ্গন ইঙ্গবঙ্গ কুলাঙ্গার চতুরঙ্গ নিস্তরঙ্গ পঙ্গপাল প্রাসঙ্গিক বঙ্গাক্ষর বিকলাঙ্গ বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্রজাঙ্গনা রণাঙ্গন সর্বাঙ্গীণ সাঙ্গোপাঙ্গো হেমাঙ্গিনি আনুষঙ্গিক লঙ্গরখানা।

ঙ্ঘ দিয়ে শব্দ ঃ জঙ্ঘা দুর্লঙ্ঘ লঙ্ঘন লঙ্ঘিত অলঙ্ঘনীয় কাঞ্চনজঙ্ঘা।

ঙ্ক্ষ দিয়ে শব্দ ঃ আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষিত নিরাকাঙ্ক্ষ শুভাকাঙ্ক্ষী হিতাকাঙ্ক্ষী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

ঙ্ম দিয়ে শব্দ ঃ বাঙ্ময় পরাঙ্মুখ।

বগলা অ্যাণ্ড কোং
জুরান নাথ
ছোটদের জন্য দেখছি কেউ ভাবছে না, সবাই বড়দের জন্য কাজ করছে। ব্যাপারটা আমাকেই দেখতে হচ্ছে।
এই পথশিশুদের আমি জোগাড় করেছি। ওদের সত্যিকারের মানুষ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমিই নিলাম।
ছোটদের জন্য কাজ করার ফল স্বরূপ আমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে! হেঁঃ-হেঁঃ!
শোনো বাচ্চারা, প্রথমেই তোমাদের আমি প্যারেড় শেখাব। নাও—শুরু করো শুরু করো—এক-দো-এক—
না, আমরা প্যারেড করব না! আমরা ঘোড়া-ঘোড়া খেলব! তুমি ঘোড়া হও!
জোর করে ছোটদের কিছু করানো ঠিক নয়। তাই—
আমি আগে চাপবো! ...না, আমি আগে!
ওরে বাবা! আমার পিঠ্! মরে গেলাম।
এরপর আমি!
না, আমি!

ওহ্! আমার কোমর! বিচ্ছুর দল! অবাধ্য হওয়ার জন্য তোমাদের বেঁধে রাখলুম।
হুম্! কী বুঝছ গনা! এই তাহলে—
ছেলে চোর! বাচ্চাগুলোকে পাচার করবে।
এবং
বাচ্চাগুলোকে ওর হাত থেকে বাঁচাতে হবে! লাফ দিয়ে ওকে কাবু করব! ব্যাটা ছেলেধরা।
ওরে বাবা! পালা সব!
ওঁক্! পু-পুলিশ কে-কেন! ওরে মা!
ওফ্স্! আমার মাথা! ব্যাপারটা কী হল বুঝলুমই না!
যাই হোক, কোনও কিছুই আমাকে রুখতে পারবে না! আমাকে নতুন করে শুরু করতে হবে!
শিগগির
আবার আমি কিছু ছেলে জোগাড় করেছি! শোনো ছেলেরা, তোমাদের প্রথমে গান শেখাব। আরে, আরে ভয় নেই। পালাচ্ছ কেন?
পালা বেচু!
ওয়াফ্স্!! গেছিরে!
হেঁইও!
গদাম্!
ওঁ-ওঁ-ওঁ! ছোটদের জন্য (বাবারে!) কিছু করা দেখছি (আ-আমার কোমর) খুবই বিপজ্জনক!
শেষ

সমালোচক হয়ে যাব

দুই শিল্পী বন্ধুর বহুদিন পরে একটা 'আর্ট একজিবিশনে' দেখা হয়েছে। প্রথম শিল্পী বেশ উদ্বিগ্নভাবে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন,—কী রে, শুনলাম তোর নাকি চোখে একটা অপারেশন হয়েছে? তা, এখন চোখে আবার ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছিস তো? ছবি আঁকতে পারছিস?

বন্ধুটি খুব হাসিমুখে উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ, তা আর পারব না কেন? আর তাছাড়া এ-নিয়ে অত চিন্তা করারই-বা কী আছে? চোখে যখন কিছুই দেখতে পাব না, তখন ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে সমালোচক হয়ে যাব।

দুহাজার টাকা লাগবে।

মোটর মালিক ঃ আচ্ছা, আমার গাড়িটা সারাতে কত পড়বে বলুন তো?

মেকানিক ঃ গাড়িটার কী হয়েছে? গণ্ডগোলটা কোথায়?

মোটর মালিক ঃ সেটা তো জানি না, বলতে পারব না।

মেকানিক ঃ তাহলে দুহাজার টাকা লাগবে।

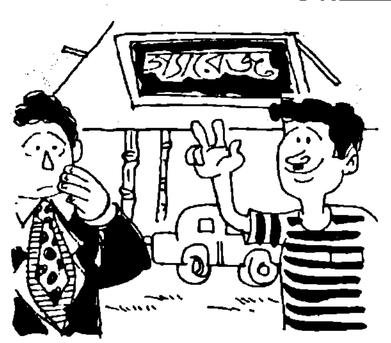

সোনা-রূপো-সিসে

বেশিরভাগ মানুষেরই যখন প্রাণভরে খরচ করার মতো অঢেল সোনা হাতে আসে, তখন তার চুলে রূপো আর পায়ে সিসে এসে গিয়েছে।

দেখেও তো শিখতে পার

স্ত্রী (খুব রাগতভাবে স্বামীকে) ঃ সত্যি, তুমি একেবারেই অপদার্থ! দেশের সরকারকে দেখেও তো শিখতে পার! সরকার তো সবসময়েই ধার করছে—কই, তার জন্য তো দুহাতে খরচ করতে সরকার একেবারেই পিছপা হয়না।

ভিটামিন ট্যাবলেট খাই

এক সাংবাদিক দেশের সবচাইতে বেশি দীর্ঘজীবী লোক বাসুবাবুর একশ তিনতম জন্মদিনে তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছেন। প্রথমেই তিনি বাসুবাবুকে প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা, আপনার এই দীর্ঘজীবন লাভের আসল কারণটা কী বলে আপনার ধারণা?

বাসুবাবু একটুও না-ভেবে চটজলদি উত্তর দিলেন আরে,—এটা বলা কোনও কঠিন কাজ নাকি? আমি যখন আটানব্বই বছরে পড়লাম তখন থেকেই যে নিয়মিত ভিটামিন ট্যাবলেট খাই।

দাঁত বনাম চোখ

এক চোখের ডাক্তার দাঁতের ডাক্তারের চেম্বারে এসে শুনলেন, ডাক্তারবাবু আপাতত কোনও রোগী দেখছেন না। চোখের ডাক্তারবাবু তো খুব চিন্তিত হয়ে বললেন,—খুবই মুস্কিলে পড়লাম তো। আমাকে যে দাঁত দেখাতেই হবে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। এরকম যন্ত্রণা নিয়ে আমি অন্যের চোখ দেখব কী করে!

দাঁতের ডাক্তারবাবুর সহকারীটি উত্তর দিল,—কী করা যাবে বলুন—কোনও উপায় নেই। ডাক্তারবাবু চোখে কিছুই দেখতে পারছেন না। যতক্ষণ না ওঁর চোখে নতুন চশমা না উঠছে, ততক্ষণ ওঁর পক্ষে কারও দাঁত দেখা সম্ভবই নয়।

ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী

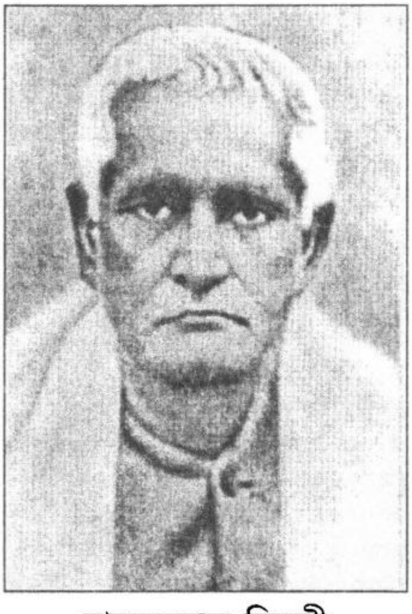

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

যাঁদের ভুলতে চাই না

দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনার কারিগর হবেন আমাদের কিশোর বন্ধুরা। পৃথিবীর অতীত ইতিহাস থেকে বন্ধুদের তাই শিক্ষা নিতেই হবে। অশিক্ষা, কুসংস্কার ও নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রত্যয়ী চরিত্র এই বাংলাদেশে কম নয়। স্মৃতির পাতা থেকে অমলিন সেই মানুষদের কথা লিখছেন

শ্যামল চক্রবর্তী

কিছু মানুষজন পৃথিবীতে বোধহয় সব পরীক্ষাতেই প্রথম হবার জন্যেই জন্মান। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন তেমন-ই একজন মানুষ। সকল পরীক্ষায় প্রথম হওয়া মানুষজনের ভেতর কেউ-কেউ কর্মজীবনে উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় রাখেন। রামেন্দ্রসুন্দর সেই দলেও পড়েন।

১৮৬৪ সালের ২০শে আগস্ট (৫ই ভাদ্র, ১২৭১) মুর্শিদাবাদ জেলার জেমোকান্দিতে রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম হয়। বাবা গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী। মা চন্দ্রকামিনী দেবী। ছোটবেলায় শরীর ভালো থাকত-না বলে গোবিন্দসুন্দর স্কুলে বেশিদূর লেখাপড়া করতে পারেন নি! বাড়িতে প্রচুর পড়াশুনো করে সেই অভাব পূরণ করেছেন। সংস্কৃত খুব ভালো আয়ত্ত করেছিলেন। শ্লোক রচনায় তাঁর পটুত্ব ছিল। কতকাল আগের কথা! সেক্সপীয়রের লেখা পড়ে তিনি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। 'বঙ্গবালা' নামে গোবিন্দসুন্দর একটি উপন্যাসও লিখেছিলেন। অভিনয় ভালোবাসতেন। গ্রামে অভিনয়ের দল তৈরি করেছিলেন। 'দ্রৌপদী নিগ্রহ' ও 'অভিমন্যুবধ' নামে দুখানা নাটক লেখেন। গণিত, বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যায় গোবিন্দসুন্দরের গভীর অনুরাগ ছিল। ধর্ম বিষয়ে তাঁর ভাবনার কথা বলতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছিলেন,

'পারমার্থিক বিষয়ে তিনি নির্গুণ ব্রহ্মবাদী ছিলেন। ঈশ্বরের তুষ্টি বা রুচির সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিতেন না। কোনরূপ কুসংস্কার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না'।

স্বদেশভাবনায় বলীয়ান উদার মনের মানুষ ছিলেন গোবিন্দসুন্দর। বাবার গুণাবলী যে ছোট্ট রামেন্দ্রসুন্দরকে প্রভাবিত করেছিল তা আমরা রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনকথা পড়লেই বুঝতে পারি।

মা চন্দ্রকামিনী কেমন ছিলেন? কথা কম বলতেন। খুব বেশি বাইরে বেরোতেন না। তবে যাকে যেটা বলবেন সেটা তখুনি হওয়া চাই। বাবা যেমন ছোটবেলায় নানা অসুখে ভুগতেন, রামেন্দ্রসুন্দরও ছোটবেলায় ভালো থাকতেন না। নানা অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকত। আপন দাদু কৃষ্ণসুন্দর রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মের বছর দুই আগে মারা যান। ফলে দাদুর ভালোবাসা তাঁর পাওয়া হয়নি। সেই অভাব দূর করেছিলেন মেজোদাদু ব্রজসুন্দর। রামেন্দ্রসুন্দরের চার বছর বয়েসে ব্রজসুন্দরের মৃত্যু হয়। তখন গোবিন্দসুন্দরের ছোটভাই উপেন্দ্রসুন্দর রামেন্দ্রসুন্দরের খেলার সঙ্গী হয়ে ওঠেন।

ঘরে যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল সেকথা আমরা আগেই বলেছি। পাঁচ বছর বয়েসে রামেন্দ্রসুন্দর বিদ্যাসাগর মশাইয়ের লেখা 'বর্ণ পরিচয়'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শিখে ফেলেন। ১৮৭০ সালে ছ-বছর বয়েসে রামেন্দ্রসুন্দর জেমোর পাঠশালায় ভর্তি হন। দূরন্তপণা তাঁর বিশেষ ছিল না। চুপচাপ থাকতেন। মাস্টারমশাইরা সবাই তাঁকে ভালোবাসতেন। গণিতে তিনি খুব ভালো ছিলেন। পাটিগণিত ভালো করতেন। দশ বছর বয়েসে জ্যামিতি প্রথম ভাগ পুরোপুরি শেষ করে ফেলেছিলেন। বাবা বাড়িতে ইতিহাসের বীরগাঁথা শোনাতেন। রাত্রের আকাশে তারা চিনিয়ে দিতেন। যা শুনতেন ও দেখতেন একবার, রামেন্দ্রসুন্দর কখনও ভুলতেন না। প্রতি ক্লাশের পরীক্ষায় রামেন্দ্রসুন্দর প্রথম হতেন। এগার বছর বয়েসে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়েও তিনি প্রথম হন।

১৯৭৬ সাল। রামেন্দ্রসুন্দর কান্দি ইংরেজি স্কুলে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হলেন। সিক্সের পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। বাবা ছেলেকে বললেন, ক্লাসের পরীক্ষায় সকলের উচ্চে না থাকিতে পারিলে গৌরব নাই'। ব্যস এইটুকুই। আর কিচ্ছু বলেন নি। রামেন্দ্রসুন্দরও তারপর কখনও কোনও পরীক্ষায় প্রথম স্থান থেকে বিচ্যুত হননি। শুধু পাঠ্যবইয়ের পোকা ছিলেন না রামেন্দ্রসুন্দর। বাইরের নানা বই পড়তেন। ওই বয়েসের একটি ছেলে এলফিনস্টোন, গিল, হিউম ও গিবনের বহু বই পড়ে ফেলেছিলেন।

সেকালে অল্পবয়েসে বিয়ের প্রচলন ছিল। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের গল্প পড়লে আমরা দেখতে পাই, স্কুল বা কলেজের ছাত্ররা বিয়ে করে সংসারি হচ্ছেন। ১৮৭৮ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়েসে রামেন্দ্রসুন্দর বিয়ে করেন। কনের

নাম ইন্দুপ্রভা দেবী। কনের বয়েস আরও কম। মাত্র আট বছর। কনের বাবা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় মুর্শিদাবাদের জমিদার ছিলেন।

১৮৮১ সালে রামেন্দ্রসুন্দর প্রথম স্থান দখল করে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। ভাবতে খারাপ লাগে, পরীক্ষার অল্প কিছুদিন আগে তিনি তাঁর বাবাকে চিরকালের মতো হারান। বাবা নেই। উপেন্দ্রসুন্দর ছিলেন। ভাইপোর পাশে-পাশে সারাক্ষণ থেকেছেন।

লেখাপড়ার এইতো শুরু। কলকাতায় এলেন রামেন্দ্রসুন্দর। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। কলকাতায় ঘর ভাড়া করে থাকতেন। সঙ্গে থাকতেন তাঁরই আত্মীয় নৃসিংহপ্রসাদ ত্রিবেদী। নৃসিংহপ্রসাদ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। প্রথম বছরের পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পেলেন। নতুন পড়াশুনোর জায়গায় এলে প্রথম বছরের পরীক্ষায় তিনি প্রথম হতে পারতেন না। কে জানে, খাপ খেতে খানিকটা হয়তো সময় লাগত।

১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন রামেন্দ্রসুন্দর। পড়ার বই পড়ছেন। রাশি-রাশি বাইরের বইও পড়ছেন। বিষয় হিসেবে 'বিজ্ঞান' তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগত। ইংরেজি সাহিত্যের নিবিড় পাঠক রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা রচনায় আগ্রহী হলেন। 'মহাশক্তি' নামে একটি রচনা 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত হল। থার্ড ইয়ারে পড়ছেন যখন, উপেন্দ্রসুন্দর মারা যান। শোককাতর হয়ে পড়েন রামেন্দ্রসুন্দর। বাবা এনট্রান্সে 'প্রথম হওয়া' দেখতে পান নি। কাকাও দেখে যেতে পারলেন না, বি.এ. পরীক্ষায় রামেন্দ্রসুন্দর প্রথম হয়েছেন। ইন্টারমেডিয়েট ও বি. এ.-দুই পরীক্ষাতেই রামেন্দ্রসুন্দর ফেলোশিপ ও স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন।

১৮৮৬ সালে বি.এ. পাশ করে রামেন্দ্রসুন্দর এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। পড়ার বিষয় রসায়ন আর পদার্থবিদ্যা। রসায়ন পড়তে তাঁর বেশি ভালো লাগত। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন পড়াতেন পেডলার সাহেব। বড়মাপের অধ্যাপক ছিলেন পেডলার। গবেষণাতেও খুব নামডাক ছিল। তিনি রামেন্দ্রসুন্দরের বি. এ. পরীক্ষার খাতা দেখে বলেছিলেন, 'আমি আজ অব্দি রসায়নের যত খাতা দেখেছি, এইটি Out and out the best'. ১৮৮৭ সালে প্রথম স্থান অধিকার করে রামেন্দ্রসুন্দর এম.এ. পাশ করেন। পরের বছরই গবেষণাপত্র জমা দিয়ে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেলেন। ওই সময়ে এই বৃত্তির পরিমাণ ছিল আট হাজার টাকা!

নানা বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের আগ্রহ ছিল। রসায়নে এম. এ. পাশ করে রসায়নেই প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। তারপর কিছুদিন জীববিদ্যায় গবেষণা করেন। আবার কিছুকাল আইনের ছাত্র বনে যান। আইনের ক্লাশ করলেও শেষ অব্দি পরীক্ষা দেননি।

কলকাতায় লেখাপড়া শেষ করে বছর দুই রামেন্দ্রসুন্দর জেমোর বাড়িতে ছিলেন। ত্রিবেদী পরিবারের জমিদারি খুব একটা ছোট ছিল না। রামেন্দ্রসুন্দর বাড়ি ফিরে পুরনো উইল খুঁজে বের করেন। এক আত্মীয়কে সব জমিজায়গা লিখে দিয়ে কলকাতায় চলে যান। আর কখনও সেই জমিদারির দিকে ফিরেও তাকাননি।

তখনও যে চাকুরি খুব সহজে পাওয়া যেত, এমনটা নয়। কলকাতায় এসে বছর দুই এনট্রান্স পরীক্ষার ভূগোল খাতা দেখে কাটালেন। ব্যাঙ্গালোর কলেজে প্রিন্সিপাল পদ খালি ছিল। পেডলার তাঁর এই প্রিয় ছাত্রকে ব্যাঙ্গালোর যেতে বলেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর বাংলাদেশ ছেড়ে বাইরে যাবেন না। কলকাতা ছেড়েও যেতে রাজি নন। যেমন কাজই পান, কলকাতা থেকেই করবেন। আর নিজের কাজের একটা জায়গা বেছে নিয়েছেন। বাংলায় লেখালেখি করবেন। আটপৌরে ভাষায় সাধ্যমত সহজ করে বিজ্ঞানের লেখালেখি করবেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে চাকুরি পেয়েও পরে বদলি হতে পারেন জেনে চাকুরি নেননি। এখানে বলে রাখা ভালো, বাংলায় বিজ্ঞান সাহিত্য রচনার অন্যতম দিকপাল রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর প্রথম বইটি ইংরেজিতে লিখেছিলেন। ছোট্ট বই। নাম 'এইডস টু ন্যাচরাল ফিলোজফি'। এই বই ১৮৯১ সালে বেরিয়েছিল।

১৮৯১ সালে উত্তর কলকাতার রিপন কলেজে রামেন্দ্রসুন্দর রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে যোগ দেন। সেদিনকার রিপন কলেজই এখন সুরেন্দ্রনাথ কলেজ নামে পরিচিত। অধ্যাপনায় তিনি ছিলেন তুলনাহীন। ইংরেজি শব্দ দু-চারটে বললেও বাংলাতেই পড়াতেন রামেন্দ্রসুন্দর। এই বিষয়ে তাঁর দৃঢ়তা কেমন ছিল, নিচের লাইনটুকু পড়লেই বোঝা যায়। কলকাতার টাউন হলে ভাষণ দিতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এই কথা বলেছিলেন।

'অধ্যাপকের আসনে বসিয়া বাঙলা ভাষায় অধ্যাপনা যদি আপনারা অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন, তাহা হইলে আমার মতো অপরাধী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঙ্ঘ মধ্যে খুঁজিয়া মিলিবে না'।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই তরুণ অধ্যাপককে যথার্থ সম্মান জানাতে দেরি করেনি। ১৮৯৪ সালে রামেন্দ্রসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে সদস্য হয়েছিলেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর তিনি সেনেটে ছিলেন। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসে রামেন্দ্রসুন্দর এনট্রান্স পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক হয়েছেন। এমন সম্মান ওইকালে দুর্লভ ছিল।

রিপন কলেজের তখন খুবই নামডাক ছিল। বাংলাদেশের বহু বিশিষ্ট প্রতিভা এই কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের বেলায় কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ ও দার্শনিক ছিলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। ১৯০৩ সালে তিনি ছ'মাসের ছুটি নেন। তখন কলেজে রামেন্দ্রসুন্দর প্রিন্সিপালের কাজ চালান। কিছুদিন পর পাকাপাকিভাবে প্রিন্সিপাল হলেন রামেন্দ্রসুন্দর। ১৯০৩ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত তিনি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। খ্যাতির প্রসারের ফলে তিনি বহু লোভনীয় পদে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেয়েছেন। কাশিমবাজারের মহারাজা তাঁকে অনেকবার বহরমপুর কলেজের প্রিন্সিপাল পদ নিতে অনুরোধ করেছেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি কোথাও যাননি। রামেন্দ্রসুন্দর পড়াতেন যখন, সময়ের খেয়াল থাকত না। পঞ্চাশ মিনিটের ক্লাস তিনঘণ্টা পর্যন্ত পড়াতেন। যেমন পাণ্ডিত্য, তেমন-ই ছিল তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম বললেই যেমন 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ'-এর নাম উঠে আসে, রামেন্দ্রসুন্দরের নাম বললে তেমনি আমাদের 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' এর কথা মনে পড়ে। বাংলা ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' তৈরি হয়। ১৩০১ সালের ১৪ই শ্রাবণ রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হন। শোভাবাজারের রাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়িতে এই পরিষৎ প্রথম তৈরি হয়। ১৩০৬ সালের ৪ঠা ফাল্গুন কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের (বর্তমান নাম বিধান সরণি) ভাড়া বাড়িতে উঠে আসে। জায়গা কম। রামেন্দ্রসুন্দর ও বিশিষ্ট দার্শনিক প্রাবন্ধিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছে গিয়ে পরিষৎ-এর বাড়ি তৈরি করার জায়গা চান। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সার্কুলার রোডে (আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড) সাত কাঠা জমি দিলেন। বাড়ি তৈরির টাকা নেই। রামেন্দ্রসুন্দর তখন পরিষৎ-এর সম্পাদক। তিনি অসামান্য ভাষায় বাঙালি জাতিকে আমন্ত্রণ জানালেন।

'...বাংলা ভাষায় যাঁহার অনুরাগ আছে,

বাঙালি সাহিত্যে যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, বাঙালির ইতিহাস যিনি জানিতে চাহেন, তিনি সেই ঝুলিতে মুষ্টিভিক্ষা করুন।'

কলেজ থেকে প্রায়দিনই বাড়ি না ফিরে পরিষৎ-এ আসতেন রামেন্দ্রসুন্দর। পত্নী ইন্দুপ্রভা দেবী ঠাট্টা করে সাহিত্য-পরিষৎ-কে তাঁর 'সতীন' বলতেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর রামেন্দ্রসুন্দর এই সারস্বত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নানা পদে কাজ করেছেন। যেদিন তিনি দেখেছিলেন পরিষৎ-এর সভাপতি হয়েছেন তার মাত্র ছ-দিন পর তিনি মারা যান। পরিষৎ আজও তাঁর স্মৃতি শ্রদ্ধার সঙ্গে বাঁচিয়ে রেখেছে। ছ-খণ্ডে 'রামেন্দ্রসুন্দর রচনাবলী' প্রকাশ করেছে। রচনাবলীর লেখালেখির কথায় আমরা খানিকটা পরে যাব।

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তিন বছরের ছোট ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। দু-জনের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরকে একবার চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে বলিলে কম বলা হয়—আপনার প্রতি আমার প্রীতি গভীর।'

রবীন্দ্রনাথ আমাদের অহংকার। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর গভীর ভালোবাসা ও প্রত্যয়ের সঙ্গে উদযাপিত হোক এই ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের চাওয়া। তোমরা জান নিশ্চয়ই, তখনও রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হননি। বাংলাদেশের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান, যারা রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল, তার নাম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। রামেন্দ্রসুন্দর সেসময় পরিষৎ-এর সম্পাদক ছিলেন। একথাও আমাদের বলা দরকার, পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ যখন রামেন্দ্রসুন্দরকে সম্বর্ধনা জানায়, সেই সম্বর্ধনা পত্র রচনা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে স্বকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ সেদিন সম্বর্ধনা পত্র পাঠ করেছিলেন। ১৯১৯ সাল। জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে ইংরেজ। রবীন্দ্রনাথ বড়লাটকে চিঠি দিয়ে নাইট উপাধি বর্জন করলেন। ছাপ্পান্ন বছর বয়সী রামেন্দ্রসুন্দর তখন চিরবিদায়ের অপেক্ষায়। কবির নাইটহুড বর্জনের কথা তাঁর কানে যায়। মন আলোড়িত হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথকে একবার শেষবারের মতো দেখতে চান। রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের পাশে ছুটে আসেন। রামেন্দ্রসুন্দরের অনুরোধে বড়লাটের কাছে লেখা চিঠির কপি পড়ে শোনান। চিঠি পড়া শেষ হয়। রামেন্দ্রসুন্দর চিরনিদ্রায় চলে যান। পাশে ছিলেন মনস্বী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি বললেন, 'আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যার বড় জাহাজ ডুবিয়া গেল।'

ভালো ছাত্র, খ্যাতিমান অধ্যাপক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর একনিষ্ঠ সংগঠক—এইসব পরিচয় ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষের কাছে রামেন্দ্রসুন্দর সার্থক বিজ্ঞানসাহিত্যসাধক হিসেবেই বেশি চিহ্নিত। ১৮৯৬ সালে তাঁর বিখ্যাত বই 'প্রকৃতি' প্রকাশিত হয়। রচনার প্রসাদগুণে তিনি কেরি, মার্শম্যান, অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। বিজ্ঞানের সমকালীন আবিষ্কার তাঁর লেখনীর উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'প্রকৃতির মূর্তি', 'পৃথিবীর বয়স', 'আকাশতরঙ্গ', 'সৌরজগতের উৎপত্তি', 'ক্লীফোর্ডের কীট', 'ফলিত জ্যোতিষ' আমরা ভুলতে পারি না। 'পরমাণু' রচনায় অণুপরমাণু কতটা বড় বোঝাতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর লিখছেন, 'এক ফোঁটা জলকে যদি কোনরূপে বড় করিয়া আমাদের পৃথিবীর সমান করিতে পারি,—যে পৃথিবীর পরিধি পঁচিশ হাজার মাইল, সেই পৃথিবীর সমান করিতে পারি,—তবে সেই জলের ফোঁটায় এক একটি অণু এক একটা বেলের মতো বড় দেখাইবে।' সব নিবন্ধের ভাষা সহজ ছিল বলা যায় না তবে কিছু-কিছু নিবন্ধ যে রসভোগ্য হয়ে উঠেছিল এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আট বছর পর ১৯০৪ সালে তাঁর দ্বিতীয় বই 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশিত হয়। খুব ছোটদের পড়বার বই 'জিজ্ঞাসা' নয়। রামেন্দ্রসুন্দর বলতেন, বিজ্ঞান আমাদের সকল রহস্যের সমাধান করতে পারে না। আমাদের তাই দর্শনের আশ্রয় নিতে হবে। তারপর বললেন, শেষ ধাপে আবার বিজ্ঞানের কাছে উত্তরলাভের জন্য আমাদের যেতে হবে। 'বিজ্ঞান-দর্শন-বিজ্ঞান' এই ছিল 'জিজ্ঞাসা' বইয়ের সার কথা। এই সংকলনেও নানা লেখার অপরূপ শিরোনাম নির্বাচন করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। কয়েকটি নাম যেমন 'অমঙ্গলের উৎপত্তি', 'সৌন্দর্যবুদ্ধি', 'মায়াপুরী', 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' ইত্যাদি। বিজ্ঞান নিয়ে যখন কলম ধরেছেন রামেন্দ্রসুন্দর, এক দার্শনিক রহস্যময়তা তাঁর বিজ্ঞানরচনাকে মাঝে-মাঝে আচ্ছন্ন করেছে। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের এই দুর্বলতা বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাঁর লেখা রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনকথায় এই দুর্বলতার পরিচয় রয়েছে। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানরচনার অগ্রপথিক রামেন্দ্রসুন্দর বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের অভিমত আমরা অবহেলা করতে পারি না।

কেউ যদি আমাদের রামেন্দ্রসুন্দরের কয়েকটি সেরা নিবন্ধ বাছতে বলেন তবে আমরা শুরুতেই 'নিয়মের রাজত্ব' ও 'ফলিত জ্যোতিষ'-এর নাম বলব। 'নিয়মের রাজত্ব' 'জিজ্ঞাসা'র রচনা। 'ফলিত জ্যোতিষ' 'প্রকৃতি'র রচনা। বাংলায় বিজ্ঞান রচনার উৎকর্ষ দেখাতে আমরা অনেকেই 'নিয়মের রাজত্ব' নিবন্ধের নানা পংক্তি পরিবেশন করি। কিছুদিন আগে যখন দিল্লি থেকে ইউ. জি. সি. আমাদের দেশের কলেজের ছেলেমেয়েদের জ্যোতিষশাস্ত্র পড়ানোর ফতোয়া দিয়েছিল, নানা প্রতিবাদের উপাদান আমরা 'ফলিত জ্যোতিষ' রচনা থেকে সংগ্রহ করেছি।

এর পর রামেন্দ্রসুন্দর ভিন্নধর্মী রচনার অনুবাদ প্রয়াসী হন। এই কাজে রামেন্দ্রসুন্দরের পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। তিনি নিজেই বলেছেন, '...বেদবিদ্যায় আমি সর্বতোভাবে অজ্ঞ ছিলাম। এই সুযোগ অবলম্বনে সেই মহতী বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিতে পারিব, এই প্রলোভন ত্যাগ করিতে আমি সমর্থ হই নাই।' কিসের সুযোগ? পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' বাংলায় অনুবাদ করছিলেন। মাঝপথে ছেড়ে দেন। তখন রামেন্দসুন্দরকে এই কাজের ভার নিতে অনুরোধ করা হয়েছিল। সাড়ে সাতশো পাতার অনুবাদ 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়।

১৯১৩ সালে ধর্ম ও দর্শন নিয়ে লেখা এগারোটি রচনা 'কর্ম্মকথা' নামে বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। এই বই থেকে আমরা বেদপন্থী রামেন্দ্রসুন্দরের পরিচয় পাই। এমন বৃত্তে রামেন্দ্রসুন্দরের পদচারণা বিজ্ঞান-রচনাকার হিসেবে তাঁর তীক্ষ্ণতা খানিকটা ম্লান করেছে বলেই মনে হয়।

১৯১৩ সালেই প্রকাশিত হয় রামেন্দ্রসুন্দরের 'চরিতকথা'। এদেশের ও বিদেশের আটজন মানুষের জীবনকথা রচনা করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। ছ-জন এদেশের মানুষ। দু-জন বিদেশের। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (১৮৭০-১৮৯৯), উমেশচন্দ্র বটব্যাল (১৮৫২-১৮৯৮)। বিদেশের হেলম্‌হোলৎজ ও ম্যাক্সমুলার। ঈশ্বরচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বিশেষ পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই। রজনীকান্ত গুপ্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক

ছিলেন। পাঁচখণ্ডে রচিত তাঁর 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' আজও এই বিষয়ের আকরগ্রন্থ। বলেন্দ্রনাথের পিতামহ ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পিতা বীরেন্দ্রনাথ। ললিতকলা বিশেষজ্ঞ। ব্রাহ্ম সংগীত রচয়িতা। দেশিয় বস্ত্রের বাণিজ্য প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। উমেশচন্দ্র সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ ছিলেন। প্রশাসনের উচ্চপদে কাজ করেছেন। তাঁর রচিত 'সাংখ্যদর্শন')১৯০০) আজও আলোচিত হয়। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' নামকরণ তিনিই করেন।

১৯১৪ সালে রামেন্দ্রসুন্দর রচিত 'বিচিত্র প্রসঙ্গ'—এর প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। তিনি তখন খুবই অসুস্থ ছিলেন। তাঁর মুখের কথা রিপন কলেজের অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত লিখেছেন। ১৯১৯ সালের ৬ই জুন রামেন্দ্রসুন্দর প্রয়াত হন। ১৯২৭ সালে এই বইয়ের দ্বিতীয় ভাগ বেরোয়। বইয়ের নানা লেখা বিচার করে একটা কথা বলতেই হয়। শাস্ত্রজ্ঞ ও বেদজ্ঞ হয়েও বিদ্যাসাগর রামমোহন যেমন ধীরে-ধীরে আধুনিকতার আবাহন করেছেন, বিজ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর পাঠক্রম প্রচারের জন্য সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করেছেন, সময়ের বিচারে খানিকটা পরে জন্মগ্রহণ করেও রামেন্দ্রসুন্দর প্রাচীনপন্থায় আক্রান্ত ছিলেন।

তাঁর লেখা নানা বইয়ের ভিড়ে আরও কয়েকটি বইয়ের নাম বলতে হয়। যেমন 'শব্দ কথা' (১৯১৭)', বিচিত্র জগৎ (১৯২০), 'যজ্ঞ-কথা' (১৯২০), 'নানা কথা' (১৯২৪), 'জগৎকথা' (১৯২৬) ইত্যাদি। দেশপ্রেমিক রামেন্দ্রসুন্দরকে বুঝতে চাইলে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬) পড়তেই হবে। হিন্দু মুসলমান পারস্পরিক ভালোবাসায় আবদ্ধ হোক, এমনটাই চাইতেন তিনি। স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের জন্য বাংলা ও ইংরেজি দু-ভাষাতেই পাঠ্যবই লিখেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। ১৮৯৩ সালে তিনি লেখেন 'পদার্থবিদ্যা', ১৮৯৮ সালে লিখেছিলেন 'ভূগোল'। জাতকের অনুবাদক খ্যাতনামা ঈশানচন্দ্র ঘোষ মশাইয়ের সঙ্গে লিখেছেন 'বিজ্ঞানপাঠ'। ১৯০২ সালে এই বই বেরিয়েছিল।

তাঁর মুদ্রিত ও অগ্রন্থিত রচনার সংখ্যাও কম নয়। নানা গ্রন্থের ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। প্রতিভার স্পর্শে সেইসব ভূমিকা স্বাধীন নিবন্ধের চরিত্র অর্জন করেছে। রামেন্দ্রসুন্দরের কিছু লেখা তোমাদের এখুনি পড়বার, অনেক লেখা এখুনি পড়বার নয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ খুব যত্ন করে ১৯৫৭ সালে রামেন্দ্রসুন্দরের নানা লেখা সংগ্রহ করে ছয় খণ্ডে 'রামেন্দ্র রচনাবলী' প্রকাশ করেছে। সামর্থ থাকলে তোমরা বড়দের বাড়িতে এই রচনাবলী নিয়ে আসতে বলতে পার।

'বিদ্যার জাহাজ' ছিলেন বলেই হয়তো বিনয়েরও অধিকারী ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। কাশী থেকে তিনি একবার 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেলেন। নিজের নামের সঙ্গে একবারও লেখেননি। জানতে চাইলে বলতেন, বিদ্যাসাগরতো একজনই, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মনীষী দীনেশচন্দ্র সেন যখন চরম কষ্টে ছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর ঘুরে-ঘুরে টাকা সংগ্রহ করেছেন। নিজের বিশ্বাসে স্থিত ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত রামেন্দ্রসুন্দর কিছুতেই ইংরেজিতে বলবেন না। দু-বার আমন্ত্রণ এসেছিল। দু-বারই প্রত্যাখ্যান করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর দৃঢ়তাকে সম্মান জানিয়েছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের পরিচয়ের গৌরব নিঃসন্দেহে আলোকময় করেছেন।

fun city

Family Entertainment Park

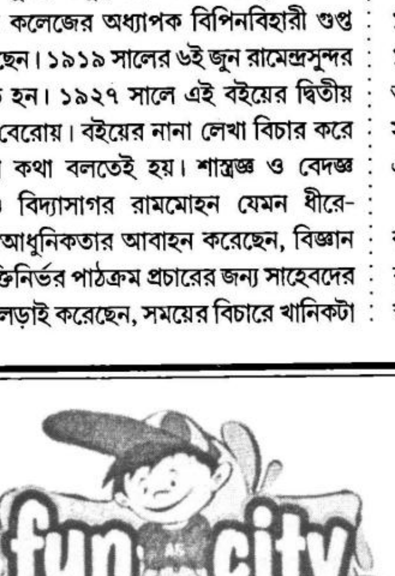

অঢেল 'ফান'!

আইসক্রিম খাওয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা? শুনেই কেমন মজা লাগছে, তাই না? চোখের সামনে ভেসে উঠছে, গবগব করে আইসক্রিম খাচ্ছে প্রতিযোগিরা। খেতে গিয়ে কেউ-কেউ সারা মুখে লেপে ফেলছে। কেউ-কেউ সত্যি-সত্যি সাবাড় করে দিচ্ছে একের-পর-এক আইসক্রিম। এমন নানাধরনের মজার-মজার খেলার আয়োজন। হ্যাঁ, ছোটদের এবং কিশোর-কিশোরীদের বিনোদনের অভিনব আয়োজন ফান সিটি বা পারিবারিক বিনোদন পার্ক। গত ১৬ মে, কলকাতায় হয়ে গেল তার শুভ উদ্বোধন। পার্কটি তৈরি হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতায়। আয়োজক এ৫ অ্যামিউজমেন্ট পার্ক।

পার্কের অধিকর্তা জিতু নরবানি বললেন, প্রথম দিনেই বিপুল সাড়া। প্রতিদিন পার্কে কম করে পাঁচশ মানুষের ভিড় হচ্ছে। শনিবার ও রবিবার আসছেন দেড় হাজারের মতো মানুষ। আমরা আশা করছি, ভিড় আরও বাড়বে।

সঞ্জয় রাংতা জানালেন, ছোটদের টেনে আনার জন্যে পার্কে আছে, জায়েন্ট রাইডস, স্লাইডস, গেমস, ডিসকো, গো-কার্টি, স্কেটিং, টয় ট্রেন, ওয়াটার গেমস, ফুড কোর্ট, ইন্ডোর ক্লাবের মতো মজার-মজার খেলা। বিশেষ করে ছোটদের বিনোদনের জন্যে আইসক্রিম খাওবার প্রতিযোগিতা সবচেয়ে বেশি সাড়া ফেলে দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ছোটরাই আমাদের প্রধান লক্ষ। এমন উৎসব সারা বছর ধরেই চলবে। কলকাতার মতো বড় শহরে বিনোদনের এমন মজাদার পার্ক নেই বললেই চলে। ফান সিটি সেই অভাব মেটাল।

ফান সিটির কিছু মজাদার খেলা বিদেশি প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি। যেমন—যাদু গ্রহ, ছোট জলাশয়, তুষারের উপর চলার জন্যে জুতো-বল, নড়বড়ে মেঝে (ডিসকো) তামাশার বাক্স, স্কেটিং, টয় ট্রেন, খেলার রাজ্য, খেলার শহর।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্থই অনর্থের মূল

হেডিংলেতে ইনিংসে (এক ইনিংস ও ৪৬ রানে) জিতে ভারতীয় খেলোয়াড়রা ক্রিকেট বোর্ডের কর্তাদের মুখের ওপর জবাবের মতো জবাব দিয়েছেন। রবিন সিংকে ক্যাপ্টেন করে একটি নতুন দলকে শ্রীলঙ্কায় মিনি বিশ্বকাপে খেলতে পাঠানো হচ্ছে বলে জগমোহন ডালমিয়া অ্যান্ড কোং যে চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন—রাহুল, শচীন আর সৌরভ তাকে হেলায় সিলি পয়েন্টে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সৌরভ বলেছিলেন,---আমরা এখন টেস্ট খেলছি। আই সি সি-র চুক্তিপত্র-টত্র নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। দেশের হয়ে খেলতে নেমেছি, দেশকে জয় এনে দিতে চাই। আমরা চাই না কেউ এখন আমাদের বিরক্ত করুক।

এ-যে কথার কথা নয় তার প্রমাণ হেডিংলের সবুজ ক্রিকেটাঙ্গণ পাঁচদিন ধরে দেখেছে। মেঘলা আকাশ, ঝিরঝিরে হাওয়া এবং পিচ সেই মুহূর্তে পেস বোলারদের পাশে দাঁড়ানোর মতো। এই অবস্থায় টসে জিতে ভারতের অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি যখন ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন এক সাহেব ভাষ্যকার (বয়কট নন) আনন্দের চোটে বলেই ফেললেন,—নির্বোধের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌরভ। এর ফল তাকে ভুগতে হবে।

তা হল বইকি। প্রথমে রাহুল দ্রাবিড়, তারপর শচীন তেণ্ডুলকর আর তারপর সৌরভ গাঙ্গুলির সেঞ্চুরি ভারতের প্রথম ইনিংসের স্কোর পৌঁছে দিল ছশর ওপর। আর তারপর ইংলন্ডকে ফলো অন করানো আর শেষপর্যন্ত ইনিংসে জিতে সৌরভবাহিনী প্রমাণ করে দিয়েছে রবিন সিং, জগমোহন ডালমিয়া কিংবা নিরঞ্জন শাহ যে কেউ ক্যাপ্টেন হোন না-কেন তাতে ইংলন্ড সফররত ভারতীয় খেলোয়াড়দের কিছু আসে-যায় না। কারণ দর্শকরা গাঁটের কড়ি খরচ করে সেরা খেলোয়াড়দের খেলা দেখতে মাঠে যান, ম্যালকম স্পিড জগমোহন ডালমিয়ার ঘুঁষোঘুষি দেখতে নিশ্চয়ই যাবেন না। স্পনসররা এগিয়ে আসেন শচীন, সৌরভ, রাহুলদের দেখে, ডালমিয়া সাহেবদের পেশি-ফোলানো দেখতে নিশ্চয়ই নয়।

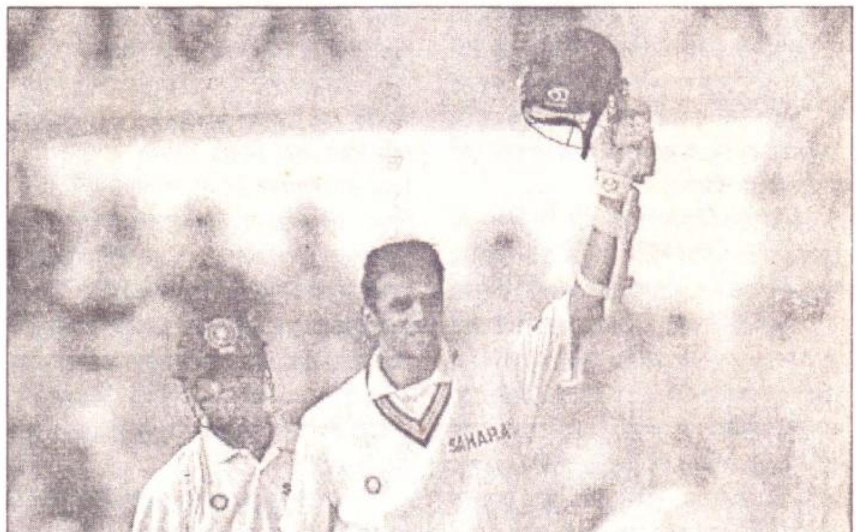

তোমরা টাকা কামাবে খেলোয়াড়দের বিক্রি করে। আর খেলোয়াড়রা তোমাদের কাছ থেকে সামান্য কিছু দক্ষিণা নিয়ে বসে-বসে আঙুল চুষবে, এমন প্রত্যাশা আই সি সির চিফ একজিকিউটিভ ম্যালকম স্পিডের উর্বর মস্তিষ্কে কে ঢোকাল কে জানে। আসলে আই সি সির লোভ বাড়িয়ে দিয়েছেন জগমোহন ডালমিয়া। তিনি যখন সভাপতি ছিলেন তখন আই সি সির ফান্ডে কোটি -কোটি টাকা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। সেই টাকাই ম্যালকম স্পিডদের শক্তির উৎস। এ কিন্তু বর্তমান লেখকের মতামত

নয়, এ উক্তি অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেলের।

তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন,—আই সি সি-র চুক্তিপত্রে সই করা অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের পক্ষে যতটা সহজ ততটাই কঠিন ভারতীয় খেলোয়াড়দের পক্ষে। ভারতীয় খেলোয়াড়রা যখন ব্যক্তিগত চুক্তিগুলো করেছেন, তখন হয়তো আই সি সির চুক্তিপত্রের অস্তিত্ব ছিল না। তাঁদের না-জানিয়ে, তাঁদের সঙ্গে কথা না-বলে ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের কর্তাদের পক্ষে আই সি সির চুক্তিপত্রে সই করা কি সঙ্গত হয়েছে? এখন যে খেলোয়াড়রা বেঁকে বসেছেন তার পেছনে তো সঙ্গত কারণ আছে।

বোর্ডের নির্দেশমতো আই সি সির ওই চুক্তিপত্র সই করলে শচীন বছরে ১৫ কোটির মতো, সৌরভ দশ, রাহুল দ্রাবিড় পাঁচ, বীরেন্দ্র সহবাগ কোটি টাকার মতো হারাবেন। তাঁদের এই বিশাল ক্ষতির দায়িত্ব কে নেবে! এই ব্যাপারে বোর্ডেরই তো উচিত এ-নিয়ে খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলা। তা না-করে বোর্ডকর্তারা শচীন, সৌরভ, রাহুলদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন রবিন সিং-এর নেতৃত্বে শ্রীলঙ্কায় দল পাঠাবেন বলে ঠিক করে। সেই সিদ্ধান্তেরই মুখের ওপর এক ইনিংসে তিনটি সেঞ্চুরির জব্বর থাপ্পড় মেরে সৌরভবাহিনী বুঝিয়ে দিয়েছেন দেশের সেরা খেলোয়াড় কারা।

এই ডামাডোলের চরম মুহূর্তে খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়াবার জন্যেই বোধহয় অমন একটা দুর্দান্ত জয় এসে গেল। এই জয় এবং খেলোয়াড়দের অভাবনীয় সাফল্য জগমোহন ডালমিয়া অ্যান্ড কোংকে ব্যাক ফুটে খেলতে যে বাধ্য করেছে সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। কারণ এই মুহূর্তে সৌরভ গাঙ্গুলি, রাহুল দ্রাবিড়, শচীন তেণ্ডুলকর, বীরেন্দ্র সহবাগ, অনিল কুম্বলে, হরভজন সিং-দের মতো খেলোয়াড়দের বাদ দিয়ে দল গড়লে তার কী ভয়ংকর রি-অ্যাকশন হবে তা হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছেন বা পাচ্ছেন ভারতীয় বোর্ডের কর্তারা। তাই তাঁরা বলতে বাধ্য হয়েছেন,—রবি শাস্ত্রী বা অন্য কারও মাধ্যমে নয় জগমোহন ডালমিয়া নিজে ভারতীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলবেন।

মাত্র কদিন আগে, হেডিংলে টেস্ট শুরু হবার আগের দিন বোর্ড সভাপতি জগমোহন ডালমিয়া বলেছিলেন,—শচীন-সৌরভদের জন্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারত একঘরে হয়ে যাবে।

ডালমিয়া সাহেবকে একটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে। আই সি সির চুক্তিপত্রে সই করে সৌরভ-শচীনরা যে তাঁদের স্পনসরদের কাছে চুক্তিভঙ্গের দায়ে পড়বেন—তার কী হবে? আসলে গোটা ব্যাপারটাই টাকার খেলা। খেলোয়াড়রা তাঁদের 'হক' ছাড়তে রাজি হতে না-চাইতে পারেন। কারণ তাহলে তাঁরা বিরাট ক্ষতি এবং ক্ষতিপূরণের মুখে পড়বেন। তা থেকে তাঁদের বাঁচাবে কে? তাঁরা যে টাকা হারাবেন তা কি বোর্ড পূরণ করে দেবেন?

অন্য দেশের ক্রিকেট বোর্ডগুলোর সমস্যা অনেক কম। কারণ সেখানে খেলোয়াড়দের ক্ষতিপূরণ করা বিরাট কোনও ব্যাপার নয়। কিন্তু ভারতীয়দের বেলায় তা খাটে না। তৃতীয় বিশ্বের এই দেশে ব্যবসা করতে এসে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের প্রচারের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে ক্রিকেটারদের। মোটা টাকার বিনিময়ে তাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। এখন যদি দেখা যায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা তাদের বুকে 'সাহারা' না লিখে অন্য কিছু লিখে নেন তাহলে কি আর সাহারা চুপ করে থেকে সব মেনে নেবে?

অসম্ভব! ফলে সব থেকে বেশি ঝামেলায় পড়েছেন ওই সব খেলোয়াড়রা। তাঁরা না-পারছেন গিলতে, না-পারছেন উগরে দিতে। এমন একটা দমবন্ধ করা অবস্থায় শেষ পর্যন্ত কী হবে? বোর্ড যদি খেলোয়াড়দের ক্ষতিপূরণ দেয় তাহলে হয়তো শ্রীলঙ্কার প্রতিযোগিতাটিতে সৌরভবাহিনী খেলতে যাবে। কিন্তু আই সি সি যদি ২০০৭ সাল পর্যন্ত তাদের চুক্তি বহাল রাখে তাহলে আগামী বছরের বিশ্বকাপের ওপর তার প্রভাব পড়বে সব থেকে বেশি। অবশ্য আই সি সি আগেই বলে দিয়েছে, চুক্তিপত্রের এই সই শুধু শ্রীলঙ্কার প্রতিযোগিতার জন্যে। লড়াই-এর ময়দানে আই সি সির অবস্থান ইতিমধ্যেই বাউন্ডারি লাইনের কাছাকাছি। বাড়াবাড়ি করতে গেলেই তাদের মাঠ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এমন বিতর্ক চুক্তিপত্র নিয়ে যে দেখা যাবে তা জানা সত্ত্বেও ভারতীয় বোর্ডের তদানীন্তন সভাপতি মুথাইয়া কেন আই সি সির প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে সই করেছিলেন। এই প্রশ্ন মুথাইয়ার দিকে ছুঁড়ে দেবার অধিকার বোর্ডের বর্তমান সভাপতি জগমোহন ডালমিয়ার নিশ্চয়ই আছে! তবে সমস্যার সমাধান তাতে কিছু হবে না। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা জানা দরকার। মুথাইয়া কি চুক্তিপত্রের ব্যাপারটা ভালোভাবে না পড়েই ভারতের পক্ষে সম্মতি জানিয়েছিলেন? কে জানে! আর যাই হোক, মুথাইয়া এই মুহূর্তে সত্যি কথা বলবেন বলে মনে হয়না। বললেও তাতে সমস্যার কিন্তু সমাধান হবে না। কারণ মুথাইয়া এই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই জগমোহন ডালমিয়াকে দায়ী করে বিবৃতি দিয়েছেন।

সৌরভ-শচীনদের কাছে এই মুহূর্তে কোনটা বড়—চুক্তিপত্রে সই করা, না ওভালের টেস্ট ম্যাচে আবার জ্বলে উঠে ভারতকে জয় এনে দেওয়া? ওয়াদেকারের দলের পর দীর্ঘদিনের ব্যর্থতার জ্বালা ভুলিয়ে দিয়ে ভারতকে যখন বিদেশে রাবার জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছে, ঠিক তখনই ওঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে জগমোহন ডালমিয়া অ্যান্ড কোং কি দেশপ্রেমের ধ্বজা উড়োচ্ছেন? ওভাল টেস্ট শুরু হবে সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখে। আশা করা যায় তার আগেই পুরো ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটে যাবে।

তাই রবিন সিং-এর নেতৃত্বে নয়, ভারতীয় দলকে শ্রীলঙ্কায় খেলতে হবে সৌরভ গাঙ্গুলির নেতৃত্বেই। অভাবনীয় কিছু না-ঘটলে ১৫ সেপ্টেম্বর সৌরভবাহিনী শ্রীলঙ্কার মাঠে খেলতে নামবে। ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডকে কথা দিতে হয়েছে যে, খেলোয়াড়রা যে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন তার দায় নেবে বোর্ড। অর্থাৎ খেলোয়াড়রা কিছু-কিছু ক্ষতিপূরণ পাবেন। জগমোহন ডালমিয়া অবশ্য একটা কথা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, খেলোয়াড়দের মুখপাত্র হিসেবে রবি শাস্ত্রীর অস্তিত্বকেই স্বীকার করে না বোর্ড। বোর্ডের সঙ্গে খেলোয়াড়দের সরাসরি কথা হবে।

সব থেকে মজার কথা হল, ভারতের সিনিয়ার খেলোয়াড়রা যদি শ্রীলঙ্কায় খেলতে না-যান তাহলে প্রতিযোগিতা থেকে স্পনসররা সরে দাঁড়াতে পারেন। কারণ এই উপমহাদেশে টি ভি এস বা পেপসির সব থেকে জনপ্রিয় মডেলের মধ্যে সৌরভ একজন। স্পনসররা সব সময় তাদের মডেলদের তুলে ধরতে চান। কিন্তু তাঁরাই যদি প্রতিযোগিতায় গরহাজির থাকেন তাহলে তো মুশকিল।

তাই শ্রীলঙ্কার মিনি বিশ্বকাপ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে আই সি সি। ভারতীয় বোর্ড যতই দ্বিতীয় দল গড়ে রাখুক—তাদের শ্রীলঙ্কায় পাঠালে ঝামেলা হবেই। সব মিলিয়ে একটা হচপচ অবস্থা তৈরি হয়েছে। এর থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে এখন ব্যস্ত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি জগমোহন ডালমিয়া। ম্যালকম স্পিডরা তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। শেষপর্যন্ত জল যে কোন দিকে গড়াবে কে জানে! কারণ চুক্তিপত্রে সই করলে সব থেকে বেশি ক্ষতি হবে শচীন তেণ্ডুলকরের। সৌরভের

গায় আঁচ লাগছে না। কারণ তাঁর স্পনসররাই শ্রীলঙ্কার যিনি বিশ্বকাপের স্পনসর। রাহুলেরও ক্ষতি হবে। ক্ষতি সবারই হবে কম বেশি। তবে যাই হোক না-কেন, খেলোয়াড়রা এককাট্টা। মাঠের মতো মাঠের বাইরেও সৌরভই নেতৃত্ব দিচ্ছেন—হ্যাঁ চুক্তির ব্যাপারেও।

শ্রীলঙ্কার মিনি বিশ্বকাপের খেলা যদি শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠভাবে হয়, তাহলেও কিন্তু আই সি সির চুক্তিপত্র নিয়ে তারপর আবার ঝামেলা শুরু হবে। খেলোয়াড়দের সঙ্গে যে-সব কোম্পানির চুক্তি আছে, আর যাই হোক, তারা তো খেলোয়াড়দের মুখ দেখে টাকা দিচ্ছে না। তাই তাদের সঙ্গে খেলোয়াড় দের সংঘাত আজ না-হয় কাল লাগবেই। তখন বোর্ড কী ভূমিকা নেয়, সেইটাই এখন দেখার।

ওদিকে আই সি সির চুক্তিপত্র নিয়ে পূর্বতন বোর্ড সভাপতি মুথাইয়ার সঙ্গে বর্তমান সভাপতির দলের ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়ে গেছে। মুথাইয়াকে দায়ী করেছিলেন ডালমিয়া। মুথাইয়া এখন উলটে জগমোহন ডালমিয়াকে বোল্ড আউট করে চলেছেন, এবং পুরো খেলাটাই হয়েছে—আরও হবে, দু পক্ষের চাপান-উতোরের মধ্যে দিয়ে। বোর্ডের নির্বাচনের সময় যত এগিয়ে আসবে, ততই দুপক্ষের কাজিয়া শুনতে হবে। আর দুপক্ষই তাদের অবস্থানের ব্যাপারে অনড়।

খেলা নিয়ে ক্রীড়া রাজনীতি অনেক হয়েছে। এবার আবার ফিরে আসি খেলার ব্যাপারে। ভারতীয় ক্রিকেটের মিঃ ডিপেনডেবল—রাহুল দ্রাবিড় হেডিংলে টেস্টে ভারতের সপ্তম খেলোয়াড় হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ৫০০০ রান পূর্ণ করেছেন। ৬৩টি টেস্টের ১০৮ ইনিংসের মধ্যে ১২ বার রাহুল ছিলেন অপরাজিত। তিনি মোট করেছেন ৫০৮০ রান। তাঁর সর্বোচ্চ রান ২০০ আর ইনিংসপ্রতি গড় রান ৫২.৯১। ১২টি সেঞ্চুরি আর ২৭ বার হাফ-সেঞ্চুরি করেছেন রাহুল। আর শূন্য রানে আউট হয়েছে দুবার।

রাহুল দ্রাবিড় ছাড়া ভারতীয়দের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেটে যাঁরা পাঁচ হাজারের ওপর রান করেছেন, তাঁদের খতিয়ান এবার নিচে দেওয়া হল ঃ

সুনীল গাভাসকর১২৫টি টেস্টে ১০, ১২২ রান

শচীন তেণ্ডুলকর ৯৯টি টেস্টে ৮১৭৬ রান

দিলীপ বেঙ্গসরকার—১১৬টি টেস্টে ৬৮৬৮ রান।

মহম্মদ আজহারউদ্দিন—৯৯টি টেস্টে ৬২১৫ রান

গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ—৯১ টি টেস্টে ৬০৮০ রান

কপিলদেব নিখাঞ্জ—১৩১টি টেস্টে ৫২৪৮ রান

ইংলন্ডের বিরুদ্ধে হেডিংলের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ পর্যন্ত ভারত ১৭২টি ম্যাচ খেলেছে বিদেশের মাটিতে। তার মধ্যে জিতেছে মাত্র ১৮টি খেলায়। ভারতীয় দল দেশ ও বিদেশ মিলে খেলেছে ৩৫৯ ম্যাচ। এর মধ্যে ভারত জিতেছে ৭২ টি টেস্টে, হেরেছে ১২০টি খেলায় এবং ড্র হয়েছে ১৬৬টি ম্যাচ। টাই হয়েছে মাত্র ১টি টেস্ট। সৌরভ গাঙ্গুলি হেডিংলে টেস্ট পর্যন্ত ২৬টি খেলায় ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার মধ্যে ১১টি টেস্টে তিনি জিতেছেন। বিদেশের মাটিতে ৩টি ছিল তাঁর পঞ্চম জয়। ভারতীয় ক্যাপ্টেনদের মধ্যে সৌরভ গাঙ্গুলিই বিদেশের মাঠে সব থেকে বেশি টেস্ট ম্যাচে জিতেছেন। বিদেশের মাঠে তিনিই ভারতের সফলতম অধিনায়ক। নিচে বিদেশের মাঠে ভারতের টেস্ট জয়ের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হল ঃ

১)	১৯৬৭-৬৮	নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে	ডুনেডিনে	জয় ৫ উইকেটে	ক্যাপ্টেন মনসুর আলি পাতৌদি
২)	১৯৬৭-৬৮	নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে	ওয়েলিংটনে	জয় ৮ উইকেটে	পাতৌদি
৩)	১৯৬৭-৬৮	নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে	অকল্যান্ডে	জয় ২৭২ রানে	পতৌদি
৪)	১৯৭০-৭১	ওঃ ইন্ডিজের বিরুদ্ধে	পোর্ট অফ স্পেন	জয় ৭ উইকেটে	অজিত ওয়াদেকার
৫)	১৯৭০-৭১	ইংলন্ডের বিরুদ্ধে	ওভালে	জয় ৪উইকেটে	ওয়াদেকার
৬)	১৯৭৫-৭৬	নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে	অকল্যান্ডে	জয় ৮ উইকেটে	সুনীল গাভাসকার
৭)	১৯৭৫-৭৬	ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে	পোর্ট অফ স্পেনে	জয় ৬ উইকেটে	বিষেণ সিং বেদী
৮)	১৯৭৭-৭৮	অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে	মেলবোর্নে	জয় ২২২ রানে	বিষেণ সিং বেদী
৯)	১৯৭৭-৭৮	অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে	সিডনিতে	এক ইনিংস ৬ ২ রানে	বেদী
১০)	১৯৮০-৮১	অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে	মেলাবোর্নে	জয় ৫৯ রানে	সুনীল গাভাসকার
১১)	১৯৮৬	ইংলন্ডের বিরুদ্ধে	লর্ডসে	জয় ৫ উইকেটে	কপিলদেব
১২)	১৯৮৭	ইংলন্ডের বিরুদ্ধে	লিডসে	জয় ২৭৯ রানে	কপিলদেব
১৩)	১৯৯৩-৯৪	শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে	কলম্বোয়	জয় ২৩৫ রানে	মহম্মদ আজহারউদ্দিন
১৪)	২০০০-০১	বাংলাদেশের বিরুদ্ধে	ঢাকায়	জয় ৯ উইকেটে	সৌরভ গাঙ্গুলি
১৫)	২০০১-২০০২	জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে	বুলাওয়া	জয় * উইকেটে	সৌরভ গাঙ্গুলি
১৬)	২০০১-২০০২	শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে	ক্যান্ডি	জয় ৭ উইকেট	সৌরভ গাঙ্গুলি
১৭)	২০০১-২০০২	ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে	পোর্ট অফ স্পেনে	জয় ৩৭ রান	সৌরভ গাঙ্গুলি
১৮)	২০০২	ইংলন্ডের বিরুদ্ধে	লিডস টেস্ট	এক ইনিংস ও ৪৬ রানে	সৌরভ গাঙ্গুলি

যে যাই হোক, সবাই এখন ব্যস্ত টাকার খেলা নিয়ে। যার জন্যে এত টাকা এত হইচই সেই খেলা নিয়ে কিন্তু কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় এইটাই।

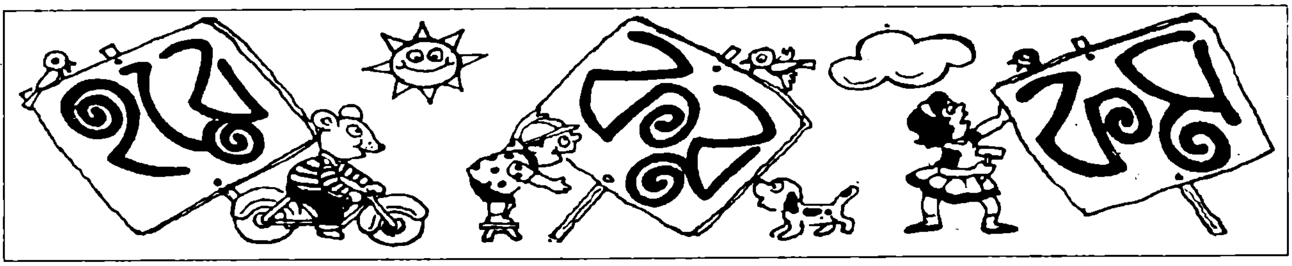

এটাই ঘটনা

একটা লোক পার্কে এসে দাঁড়াল। তার মুখভর্তি খাবার। নিজে খাচ্ছে না, কিন্তু মুখের মধ্যে ঠাসা রয়েছে। তারপর? একটা করে পাখি আসে আর লোকটার মুখ থেকে খাবার খেয়ে যায়। একটা করে পাখি আসে...কী ভাই? গল্প ঠাওড়ালে নাকি? মাদ্রিদে থাকে এমনই একজন। ম্যাগড্যালেন তার নাম।

এক যে ছিলেন রাজা। বলিহারি রাজার কুকুরপ্রীতি। তাঁর পোষা কুকুর বাচ্চা দিলেই রাজকাজ মাথায় ওঠে কুকুরের বাচ্চাকে ঝুড়িতে বসিয়ে সেটা গলায় ঝুলিয়ে রাজা বেরোন ঘুরতে। ফ্রান্সের এই রাজা কে জানো? রাজা তৃতীয় হেনরি।

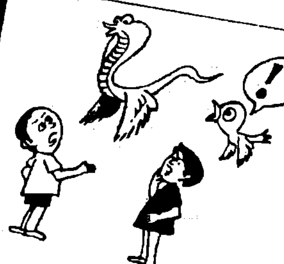

কালে-কালে কী যে হল! সাপও নাকি উড়ছে! শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী জাকে সোচা-র তোলা ভিডিও-টেপে দেখা গেছে সিঙ্গাপুরের এক চিড়িয়াখানার মাঠে কয়েকটা সাপ ৩৩ ফুট উঁচু টাওয়ার থেকে উড়ে যাচ্ছে। এই 'প্যারাডাইস ট্রি স্নেক'-এর বিষ নেই। দৈর্ঘ্য তিন থেকে চার ফুট। দেখা পাবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়।

দূরালাপ

লিয়েন্ডার পেজ

২৪৭ ২৬২৫

রেবতীভূষণ

৬৫৪ ০৯৮৯

বকবকানি

কিশোর বন্ধুরা,
কী খবর বলো? কেমন আছ সব?
এই দেখো না দেশে আজও খুনোখুনি, ধুন্ধুমার। একুশ শতকেও দেখতে হচ্ছে সতীদাহ! কী লজ্জা! কী লজ্জা! আর হ্যাঁ, জানো তো পুজো 'হরে কর কম'-এ এবারও থাকছে অনেকরকম প্রতিযোগিতা। অনেক পুরস্কার!! ৬x৬ ছকে শব্দহেঁয়ালি সকলেই করে পাঠাতে পারো।
ভালো থেকো। ভালবাসা নিও।
তোমাদের পরিচালকবন্ধু

ঠিকঠিকানা

হৃতিক রোশন *(অভিনেতা)*
37, Kavita, 11th Road, J.V.P.D. SCHEME, JUHU, MUMBAI 49

প্রভাত রায় *(পরিচালক)*
৩১১/৮, প্রিন্স আনোয়ার শা রোড
কলকাতা ৪৫

চাপান উতোর

পাঠকদের দরবারে হাজির

শৈলেন মান্না

(অতীত দিনের প্রাক্তন খেলোয়াড়)

ভারত কেন বিশ্বকাপে যেতে পারে না?
অনেক সমস্যা। অনেক জটিলতা। ওখানে খেলার মতো 'স্ট্যান্ডার্ড' আমাদের নেই। খেলোয়াড় নেই। নেই উপযুক্ত প্রশিক্ষণও। মাঠ নিয়েও সমস্যা। সেরকম মাঠ বা পরিবেশ এখানে নেই। অলিম্পিকের দল নিয়ে গেলে কিছু খেলতে পারি, কিন্তু 'কোয়ালিফাই' তো করা দরকার।

বিদেশি খেলোয়াড় আনা খুব জরুরি?
বিদেশি খেলোয়াড় আসুক না। আপত্তি কিসের? কিন্তু, সেইসঙ্গে এটাও দেখা দরকার, কাদের আমরা আনছি।

গ্রামে-গঞ্জে তো অনেক ফুটবল প্রতিভা রয়েছে। এদের কথা কি ভাবা যায় না?
কে তাদের বাছাই করবে? তাছাড়া বাবা-মায়েরা তাদের ১২/১৪ বছরের ছেলেকে ছাড়বেই বা কেন? চার-পাঁচ বছরের জন্য নিয়ে প্রশিক্ষণ দিলেই যে বিশ্বকাপে যাবার মতো খেলোয়াড় হবে—তার 'গ্যারান্টি' কোথায়? পড়াশোনাও চালিয়ে যাওয়া দরকার খেলার প্রশিক্ষণের সঙ্গে-সঙ্গে—সেই পরিকাঠামো কই? অনেক জটিলতা ভাই।

কী খেতে ভালবাসেন?
আমি সব খাই। মিষ্টি, মাছ সব কিছু। তবে রাতে ভাত খাই না।

ছোটদের জন্যে কী পরামর্শ?
ছোটদের একটা শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে হবে। ঠিক সময়ে খেলতে যাওয়া, খেলা থেকে ফিরে আসা—এসব অবশ্য বাবা-মায়েদেরই দেখতে হবে।

১) 'বাংলার বজ্র' কাকে বলা হয়?
পার্থপ্রতিম অধিকারী, উত্তরপাড়া

২) মানুষের শরীরে কটি মাংসপেশী রয়েছে?
সোমনাথ বোস, নদীয়া

৩) 'আন্নাকালী পাকড়াশি' কার ছদ্মনাম?
প্রসেনজিৎ সামন্ত, আলমবাজার

৪) ১৯৯৯ সালে গান্ধী শান্তি পুরস্কার কে পান? **নয়ন বসু, হরিপাল**

৫) কেরল প্রদেশের রাজধানীর নাম কী?
মহুয়া সেন, গোঘাট

৬) কোন্ খেলার সঙ্গে 'checkmate' শব্দটি দাবা যুক্ত? **অর্ক মিত্র, বর্ধমান**

৭) কুতুবমিনার কত সালে তৈরি হয়?
অগ্নিভ রায়, বরানগর

ঠিক জবাবে ইনাম পাবে

৮) মহাভারতের আসল নাম কী?
বিপ্লব ভট্টাচার্য, শ্রীরামপুর

৯) 'মাই টুথ' বইটি কার লেখা?
পিন্টু দেবনাথ, আসানসোল

১০) কোন্ সালে ভারতে প্রথম ডাকটিকিট চালু হয়?

জুলাই সংখ্যার উত্তর

১) গুইড গাইড ২) মিলখা সিং ৩) রাতভোর ৪) ভারত ৫) জর্জ বার্নাড শ ৬) ডাইন ৭) কর্ণফুলি ৮) নারায়ণ সান্যাল ৯) লিবিয়া ১০) Memorandum of Understanding

পুরস্কার পাচ্ছে
শুভঙ্কর চক্রবর্তী আজিমগঞ্জ
৬টি উত্তর যারা ঠিক দিয়েছে
নমিতা নেয়ে ও সোমনাথ বোস

নিজে করো

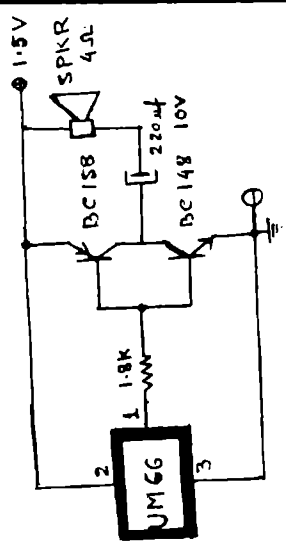

মিউজিক ডোর বেল

তৈরি করতে যা যা লাগবে
IC UM66
BC 158
BC 148
220 uf/10v
1.8 K
লিখে পাঠিয়েছে **উত্তম সাধুখাঁ**

বন্ধু চাই

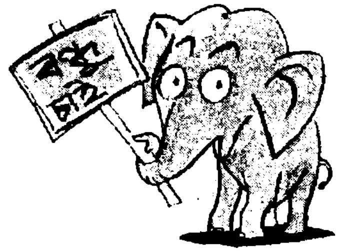

অর্কপ্রতাপ ঘোষ
২এ রাজনারায়ণ বিশ্বাস লেন
কলকাতা ৭০০০০৫
শখ : ডাকটিকিট জমানো ও পত্রমিতালি

সায়ন্তী কর
প্রযত্নে : প্রদীপ কুমার কর
৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন
বেলুড়মঠ, হাওড়া ৭১১২০২
শখ : গল্পের বই পড়া, গান শোনা ও ভ্রমণ করা।

দিল আফরুজা (টকি)
প্রযত্নে : ডঃ আব্দুস সামাদ
গ্রাম ও ডাক : ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ
শখ : গান করা ও বিভিন্ন গানের অনুষ্ঠানে যাওয়া।

হেঁয়ালি

১) মিথিলা নগরে করল চুরি
হস্তিনা নগরে পড়ল ধরা,
লঙ্কারাজ করলেন বিচার—
হুঙ্কার দিয়ে মারলেন তাকে।

২) কাঁচায় তুলতুল
পাকায় সিঁদুর,
যে-না বলতে পারে
সে আস্ত ধেড়ে ইঁদুর।

লিখে পাঠিয়েছে
প্রতীক দাশগুপ্ত ও সোমনাথ বোস

জুলাই সংখ্যার উত্তর
১) দিদিমা-মা-নাতনী
২) ৪ এবং ২

পুরস্কার পাচ্ছে
মানালী দিকপতি (১১)
বিদ্যার্থীভবন বালিকা বিদ্যালয়, বর্ধমান। সকলের উত্তর সঠিক হওয়ায় লটারি করা হল

উত্তরদাতাদের নাম

তৃণা নন্দী, মৌর্য্য ঘোষ, গোবিন্দ দাস, রণি চৌধুরী, দীপিতা লাহিড়ী, সোমনাথ বোস সোমনাথ দাস, ময়ূরী মুখোপাধ্যায়, স্বরূপ কুণ্ডু, আব্দুস সাত্তার, সায়ন্তী কর ও কুনালজিৎ রায়।

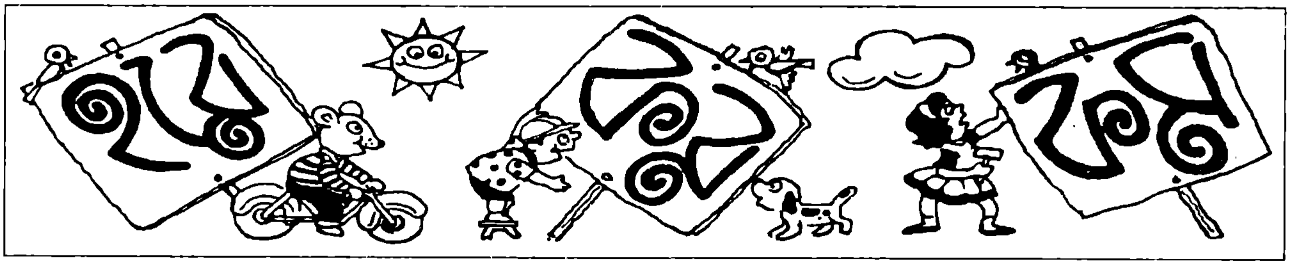

গল্পাণু

বিষয় ছিল—সেনেগাল বিশ্বকাপ খেলে। একশ কোটির ভারত কেন পারে না?

আকার, আয়তন, লোকবল ও অর্থ-সব দিক থেকেই ভারতের তুলনায় সেনেগাল দুর্বল হয়েও বিশ্বকাপে যেতে পারল, ভারত পারল না—এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যের। ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তা গোটা বিশ্বে বাড়লেও ভারতে, মনে হয়, কমছে। ক্রিকেটজ্বরে আক্রান্ত ভারত ফুটবলকে বেশি গুরুত্ব দেয় না। খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ পাবার সুযোগ নেই। নেই দক্ষ প্রশিক্ষকও, বিশ্বকাপে যেতে গেলে যে উদ্যম ও মানসিকতার দরকার তার ভীষণ অভাব

খেলোয়াড়দের মধ্যে। তাছাড়া সরকার ও জনসাধারণের সহযোগিতা, আন্তরিকতারও বেশ ঘাটতি রয়েছে। নোংরা খেলা আর পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিই বেশি দেখি এখানে।

বিদেশী খেলোয়াড় নয়, আমাদের দেশেই অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে, তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হোক। ভালো মাঠ চাই। পরিকাঠামোরও বদল দরকার। নিশ্চয়ই ভারত একদিন বিশ্বকাপ খেলবে।

লিখে পাঠিয়েছে **হেনা বসু**, সোনারপুর
হর্ষ ঘোষ ও সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের লেখাও ভালো লেগেছে।

বাতেলা

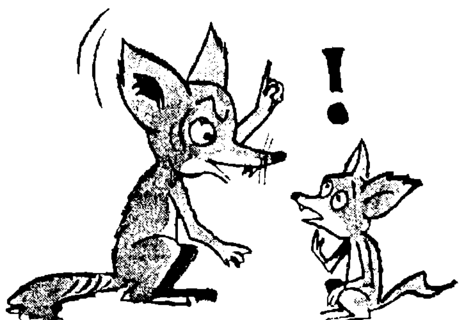

বেড়াচিকন্দী স্টিমারঘাটে এক দুপুরবেলায় দাঁড়িয়ে আছি স্টিমারের অপেক্ষায়। নদীর পাড়ে দুটি বছর দশেকের ছেলে খুব আস্ফালন করে কুস্তি শুরু করল। যে ছেলেটি বেশি বড়াই করছিল একটু পরে সে-ই কাবু হয়ে নিচে পড়ল। অন্য ছেলেটি তার পেটের ওপর বসে এমনভাবে চেপে রাখল যে বেচারার তখন 'নট নড়নচড়ন' অবস্থা। আমি বললাম, যা! তোমাকে এভাবে নিচে ফেলল!

নিচে পড়া ছেলেটি বলল ঃ না, না, আমি ইচ্ছা কইরাই নিচে পড়েছি। দেখতাছেন না অর পিঠে কেমন রোদ লাগতেছে! আমার গায়ে লাগতেছে না!

বিনয় বাগচী নদীয়া

শব্দ হেঁয়ালি

১	২	■	৩		৪
৫				■	
■		■	৬	৭	
৮		৯	■		■
	■	১০			১১
১২			■	১৩	

কৃষ্ণপদ নাথ

পাশাপাশি ঃ ১) অভিপ্রায়, প্রকৃতি, জন্ম ৩) সোনা ৫) স্বামীর বোন ৬) নতুন ৮) প্রবল শখ, পাগলামী ১০) হিঙ্গুল ১২) সংস্কৃতিবাজ, রঙ্গপ্রিয় ১৩) গান গাওয়া হয়েছে এমন।

উপর-নিচ ঃ ১) দীপ্তি, শোভা, ছল ২) যে বড় গাছে ফুল হয় না ফল ধরে না ৩) কুমারীর গর্ভজাত ৪) পুত্র, আনন্দদায়ক ৭) বিরক্তভাব, অনাসক্ত-যুক্ত ৮) কপি, নরের পূর্বপুরুষ ৯) লক্ষ্মীদেবী, ফল বিশেষ ১১) অতীত, সমাপ্ত।

জুলাই সংখ্যার উত্তর

পাশাপাশি ঃ ১) জ্ঞান ৩) ফসিল ৬) তিলেক ৮) কিল ৯) নর্ম ১১) তদা ১৩) বদ ১৫) মদত ১৭) কলাপ ১৮) নট

উপর-নিচ ঃ ১) জ্ঞাতি ২) নলেন ৪) সিকি ৫) ললনা ৭) কর্ম ১০) ধ্রুবক ১১) তম ১২) দাদন ১৪) দলা ১৬) তট।

ছকে ভুল সত্ত্বেও যারা চেষ্টা করেছে
দীপিতা লাহিড়ী, শক্তিপদ নেয়ে ও সোমনাথ বোস

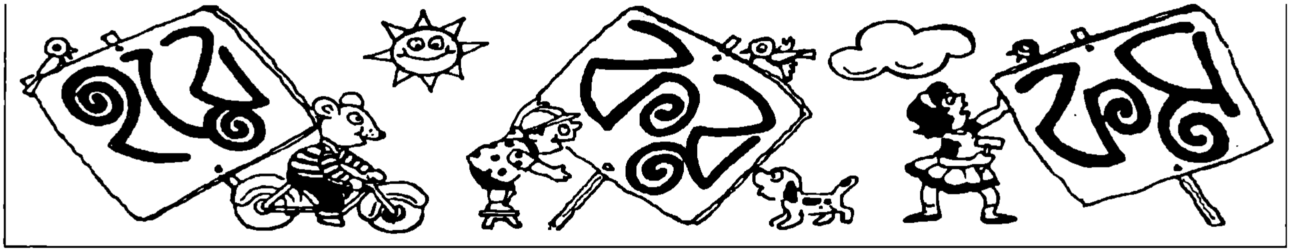

জুলাই মাসের সেরা ছড়া

টুপুর টাপুর মাথায় ছাতা,
পুকুর যেন এ-কলকাতা!
হাঁটু সমান ময়লা জলে
মানুষ-যান সব সাঁতরে চলে!!

রূপা বসু, ডায়মন্ডহারবার

ভালো লেগেছে :
শিল্পী বসু, রূপরাধা ঘোষ, মিতা বসু, স্বরূপ কুণ্ডু, পার্থপ্রতিম অধিকারী

ছড়া গড়া

চার লাইনের প্রথম দুটো লাইন দেওয়া হল। সঙ্গে ছবি। ছড়াটা বানিয়ে জলদি পাঠাও আমাদের ঠিকানায়—

চলল কোথা রেলের গাড়ি?
পুজোয় যাব গ্রামের বাড়ি।

মজারু

ট্রেনে-বাসে পার্কে বা রাস্তাঘাটে মজার-মজার অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়। মনের মধ্যে এগুলো নাড়াও দিয়ে যায় বেশ। এমন কোনও অভিজ্ঞতা তোমাদের হয়ে থাকলে ১০০ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠাও শিগগির! ছাপা হলেই পুরস্কার!

কথার কচকচি

আজ আকাশ অনেক নীল,
আজ আকাশ অনেক নীল—

কথাটা কত তাড়াতাড়ি কতবার বলতে পারবে একটুও না বদলে? এই ধরনের কথা তোমরাও লিখে পাঠাও। পুরস্কার হিসেবে লেখা ও লেখকের নাম ছাপা হবে।

সইসাবুদ

জীবনানন্দ দাশ

ক্ষুদিরাম বসু

উত্তমকুমার

গা ল গ প্পো

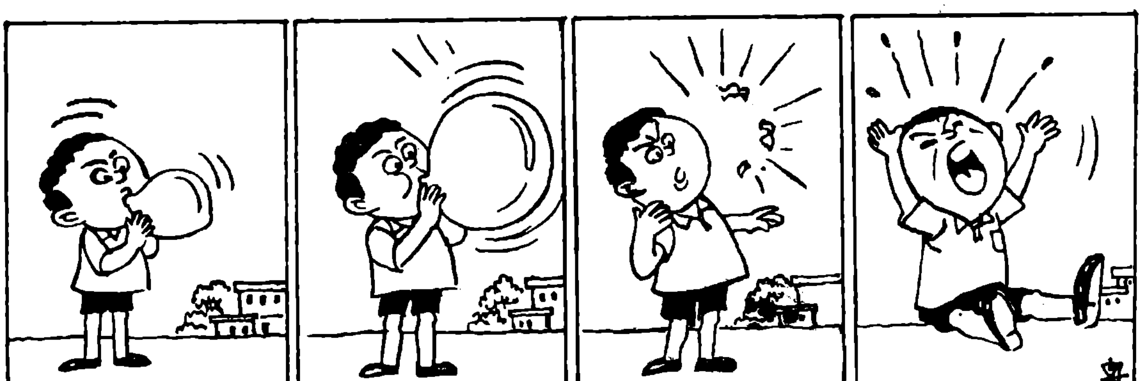

পরিচালক শুভাশিস ঘোষ ছবি জুরান নাথ

বইয়ের দুনিয়া

জেনারেল নলেজ

কলকাতার কথা, পশ্চিমবঙ্গ-বাঙলা ও বাঙ্গালি, ভারত আমার ও বিশ্বপ্রসঙ্গ—এই চারটি পর্যায়ে অত্যন্ত সুচারুভাবে ও মুন্সিয়ানার সঙ্গে তথ্য সমাবেশ ঘটিয়েছেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার উপযোগী হাতের কাছে একটি অপরিহার্য ও পূর্ণাঙ্গ সংকলন গ্রন্থ, যেটি ইউনেস্কো ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কারও পেয়েছে ইতিমধ্যে। শিক্ষার্থীরা বইটি সংগ্রহ করতে পারলে লাভবানই হবে।

হ্যান্ড বুক অব জেনারেল নলেজ অমরনাথ রায়। শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯।

শুভাশিস ঘোষ

রহস্য-রোমাঞ্চ

অলৌকিক কাহিনী রচনার জন্য একটি অত্যাবশ্যক উপাদান পরিবেশ। পটলডাঙার প্যালারামের কথা ধার নিয়ে বলা যায়, ভূত তো আর কলেজ স্কোয়ারে বসে বাদাম চিবোতে আসবে না! অনীশ দেবের 'আমি পিশাচ' তাই খুঁজে নেয় আধা-মফস্বলে অবস্থিত এক স্কুলবাড়ি, যার 'লাগোয়া খেলার মাঠ আর বাগান। মাঠে বর্ষার সবুজ ঘাস। কোথাও-কোথাও জল জমে আছে । ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে।' এরপর এই রক্তপিপাসু প্রেত আশ্রয় নেয় 'স্যাটাস্যাট' স্যারের শরীরে। ক্লাস নাইনের ছাত্র অচ্যুত, কুলদীপ, রাজীব, সৌরভ আর বাসব আস্তে-আস্তে জড়িয়ে পড়ে রক্তপিশাচের সঙ্গে এক অসমসাহসী প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

এ-বই একবার হাতে তুলে নিলে পুরোটাই শেষ করতে হবে—কাহিনীর এতটাই টানটান উত্তেজনাময়। আর ভূতের গল্প হলেও বইতে 'ছাপাখানার ভূত'-এর আক্রমণের চিহ্ন নেই, মুদ্রণ পারিপাট্যে একেবারে দশে দশ।

বিজন কর্মকারের আঁকা প্রচ্ছদ এবং বইয়ের মধ্যের ছবিগুলি গল্পের রোমাঞ্চকে আরও গাঢ় করেছে।

আমি পিশাচ অনীশ দেব। পত্র ভারতী ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৯।

সুমন রায়

বাংলা ভাষা শিখতে হলে

'মোদের গরব মোদের আশা/আমরি বাংলা ভাষা'—অতুলপ্রসাদের এই কাব্য-পংক্তি আমরা আজ কতখানি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায়। ইংরেজ সেই কবে এ-দেশ থেকে বিদেয় হয়েছে। এতকাল পরেও আমরা চট করে বাংলায় কিছু লিখি না। হোক না ভুল ইংরেজি, তবু ইংরেজিতে লিখেই স্বস্তি পাই বেশি। ছেলেমেয়েরা ইংলিশ মিডিয়ামে না-পড়লে পাড়া-প্রতিবেশির কাছে মান-সম্মান থাকে না। এই সেদিনের রাষ্ট্র বাংলাদেশ বাংলাভাষা চর্চা, প্রচার ও প্রসারে যে-কাজ করেছে, তার ছিটেফোঁটাও আমরা করতে পারি নি।

আমাদের বাংলাভাষা কম সমৃদ্ধ নয়। সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের খবর এখন আর কজনই- বা রাখে! এ-কালের ছোটরা আর সে-ভাবে বইটই পড়ে না। ছোটরা তো বটেই, এখন বড়রাও অনেকে নির্ভুল বাংলা লিখতে পারে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষ ভট্টাচার্য একটি চমৎকার কাজ করেছেন। এ-বই পড়ে ছোটরা শুধু নয়, বড়রাও উপকৃত হবেন। বাংলাভাষায় অনেক খুঁটিনাটি দিক নিয়ে গল্পচ্ছলে তিনি আলোচনা করেছেন। জটিল বিষয় ও উপস্থাপন গুণে ভারি সরস, উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। এ-বই ছোটদের হাতে-হাতে ঘুরুক। তারা নির্ভুল বাংলা শিখুক। আমরা বড়রা না-হয় ওদের ওপর একটু আস্থা রাখি। মাতৃভাষায় দখল থাকলে অন্য ভাষা অতি সহজে, অনায়াসে শেখা যায়। বাছারা বাংলা শিখুক, মায়ের ভাষা শিখুক। বাংলাতেই স্বপ্ন দেখুক।

বাংলা ভাষার সাত-সতেরো সুভাষ ভট্টাচার্য। আনন্দ পাবলিশার্স।

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের বই আমাদের অহংকার

পত্র ভারতী

৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২৪১ ১১৭৫ ফ্যাক্স ৩৫৪ ০৪৬২
e-mail : patrabha@vsnl.net

Postal Regn. No. WB/RNP 242, N. P. Regn. No. 16599/68. SEPTEMBER 2002 Rs. 10.00